২৩৬

সাক্ষরতা বুলেটিন

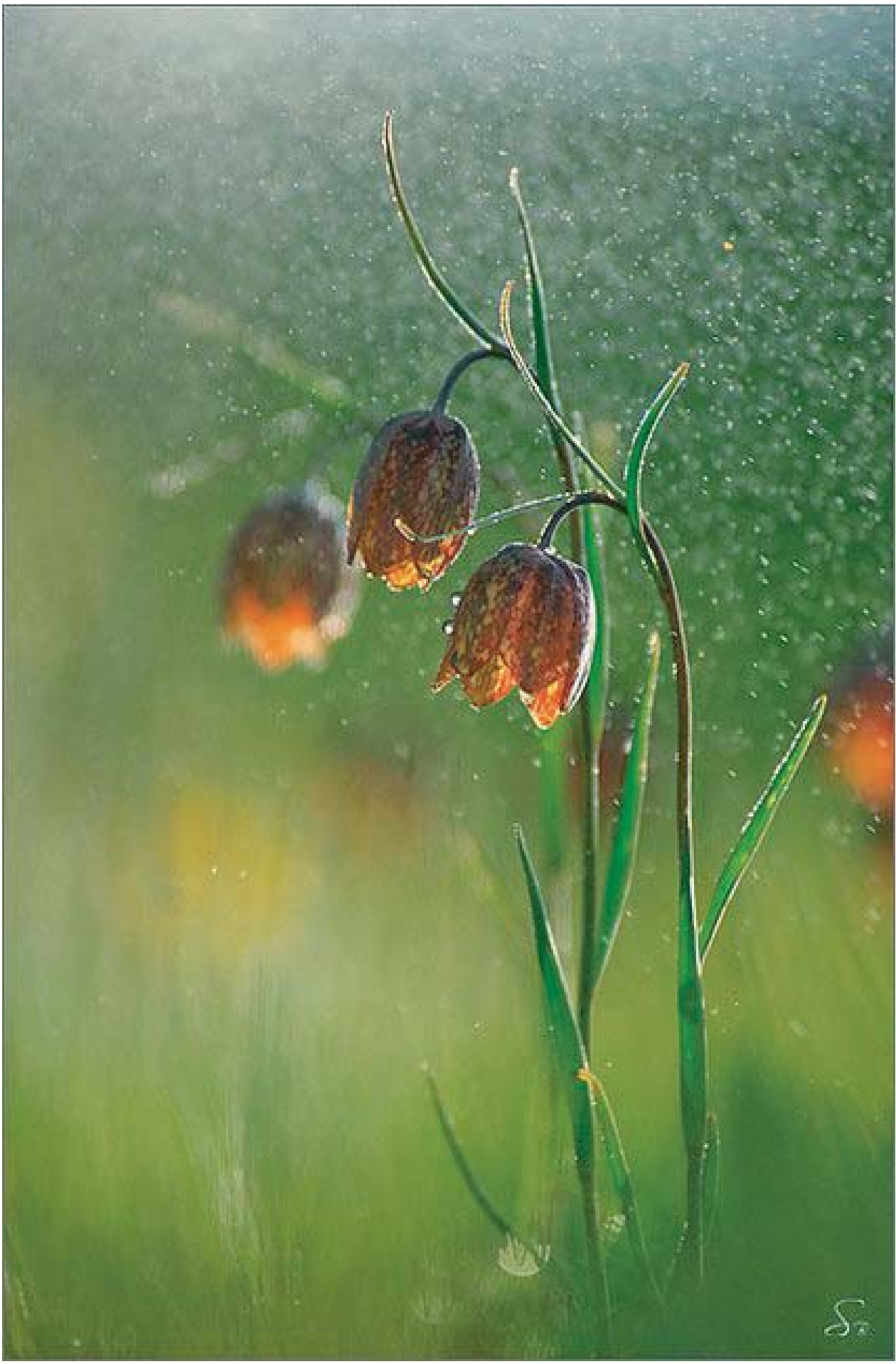

মাঘ ১৪২০

জানুয়ারি ২০১৪

সাক্ষরতা বুলেটিন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের
বেসরকারি ঐক্য প্রতিষ্ঠান
গণসাক্ষরতা অভিযান
থেকে প্রকাশিত

সংখ্যা ২৩৬ মাঘ ১৪২০ জানুয়ারি ২০১৪

সূ চি প ত্র

৪ শর্বরী আলোময়ী
শ্রদ্ধাভাজনেষু, আপনাকে বিনম্র অভিবাদন

৭ শফি আহমেদ
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যেন ধ্বংস ও হিংসার বলি না হয়

১২ সচিত্র শিক্ষা সংবাদ: জানুয়ারি ২০১৪

১৭ সিরাজুদ দাহার খান
সংলাপ: একটি কিশোরী-ক্ষমতায়ন পন্থা

২৫ সাকিলা মতিন মৃদুলা
নারীশিক্ষার কক্ষপথে

২৭ তথ্যকণিকা

২৯ সংবাদ

সাক্ষরতা বুলেটিন-এ প্রকাশিত রচনাসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, মতামত সম্পূর্ণত লেখকের, গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃপক্ষের নয়।

সৌজন্য:
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আকস্মিকভাবে, আমাদের সকলকে শোকে স্তব্ধ করে। তাঁকে আমরা নানা অভিধায় অভিহিত করি। সত্যিই তিনি ছিলেন আমাদের সমাজের মুক্তচিন্তার অনুপম প্রতীক। কেউ তাঁকে বলেছেন আলোর দিশারী। তবে একথা ঠিক যে, এই স্পর্শযোগ্য সমকালে তিনি ছিলেন আমাদের বিশ্বস্ত অভিভাবক।

আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনে তিনি ছিলেন এক অকুতোভয় কর্মী। সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারক হিসেবে তিনি অতুলনীয় দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। জাতির এক পরম ক্রান্তিকালে তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেছেন অবিচল সাহসিকতায়। সচল লেখনীর মাধ্যমে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনে শুদ্ধতা ও শ্রমনিষ্ঠ গবেষণার অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে জাতির যে ক্ষতি হল, তা সর্বতো অর্থেই অপূরণীয়।

আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

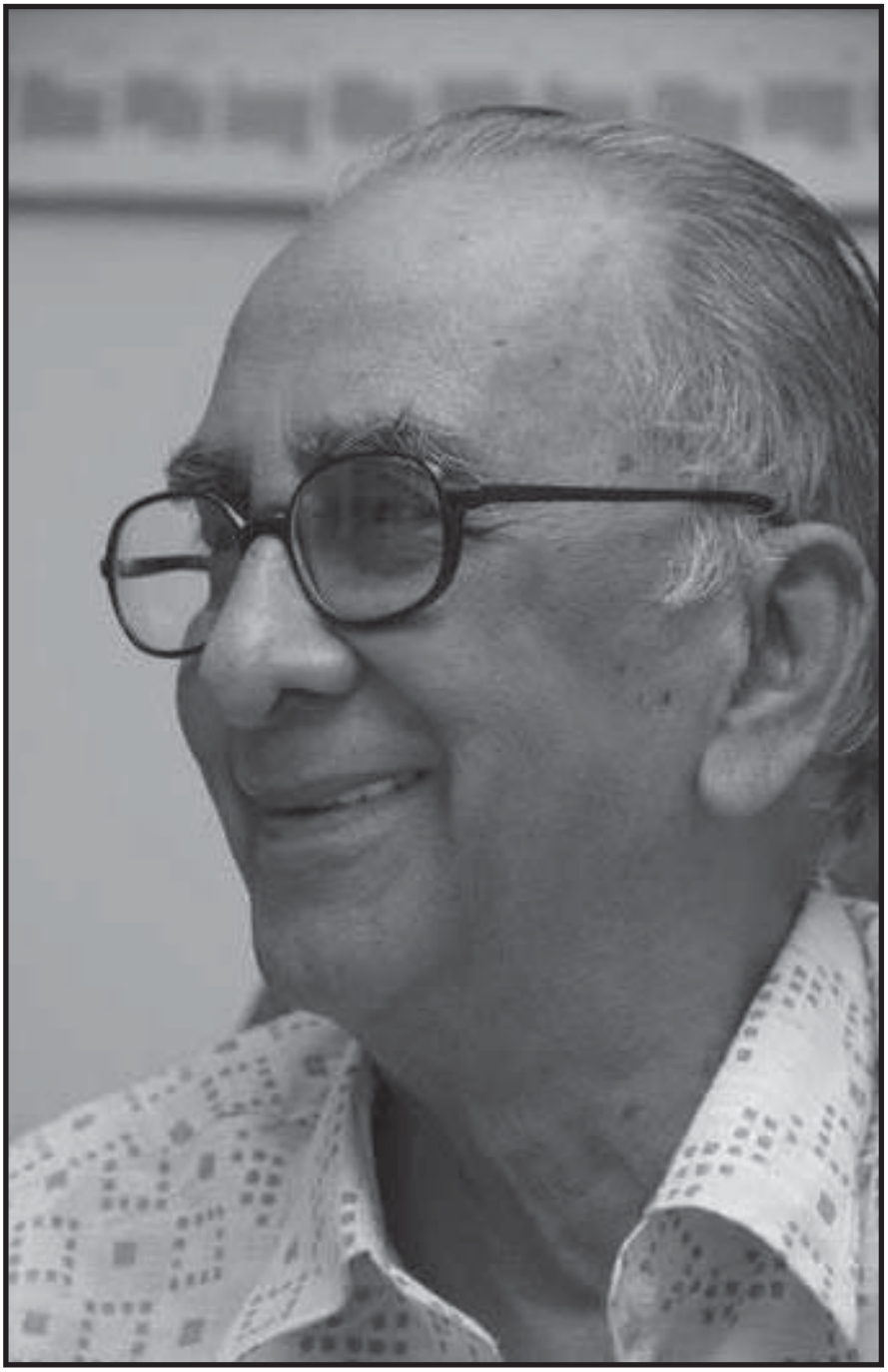

শ র্ব রী আ লো ম য়ী

শ্রদ্ধাভাজনেষু, আপনাকে বিনম্র অভিবাদন

সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল কিছু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কোন একজন লেখক একটিমাত্র সৃষ্টির দ্বারা জগতজোড়া এবং স্থায়ী খ্যাতির একটা আসনকে পাকাপোক্ত করে নিয়েছেন। শিক্ষার্থী হিসেবেই প্রথম পড়েছিলাম এমিলি ব্রন্টি নাম্নী এক ইংরেজ লেখিকার *Wuthering Heights*। যে কোন কারণেই হোক, ওই বইটার নাম আগে শুনিনি, বাড়িতে অন্য কয়েকজন প্রখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিকের নামকরা সব রচনার কিছু প্রামাণ্য, কিছু সহজপাঠ্য সংস্করণ থাকলেও এমিলি ব্রন্টির ওই বইটা ছিল না। ছাত্রী হিসেবে ওটার বাধ্যতামূলক পাঠ যে কিভাবে আমাকে স্পর্শ করেছিল, সেকথা ভাবলে আজও শিহরিত হই। মনে পড়ে, ওই গ্রন্থের কাহিনী এক বাঙালি তরুণীর কিছুটা অশ্রু আদায় করেছিল। এসব আত্মজৈবনিক কথা বলার জন্য এই রচনাটি লিখতে বসিনি।

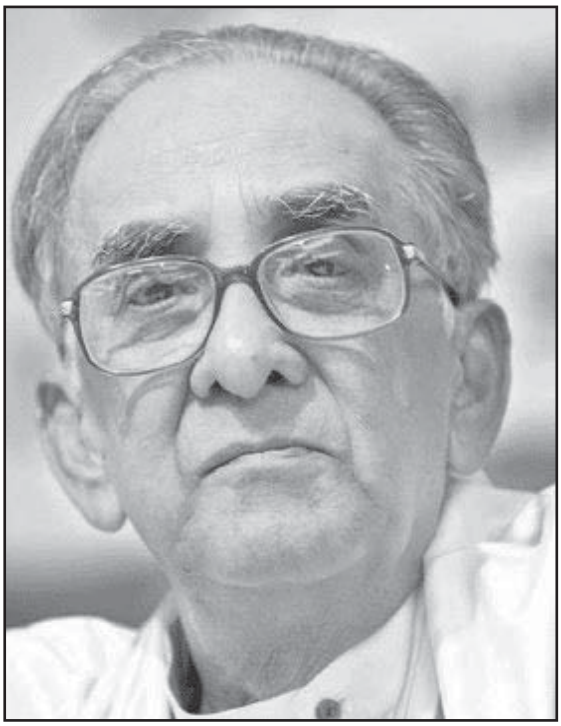

আমি আসলে এমন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে একটা অতি সংক্ষিপ্ত শ্রদ্ধাভাষ্য রচনা করার চেষ্টা করছি, যাঁর একটি গ্রন্থ বিষয়ে যখন আমি প্রথম অবহিত হই, তখন মনে হয়েছিল, শুধু এইটাই তো তাঁকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে একটা অটল স্থানের নিশ্চয়তা দিতে পারে। আমি বলছি সম্প্রতি প্রয়াত বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের কথা। তাঁর মৃত্যুর পর বেশ কয়েকজন তাঁকে নিয়ে লিখেছেন, নাগরিক শোকসভা আয়োজিত হয়েছে, এমন প্রস্তাবের কথা শুনেছি যে, বাংলা একাডেমির সমাগত একুশে গ্রন্থমেলা নাকি তার নামে উৎসর্গ করা হবে।

তাঁকে নিয়ে যে এত কোলাহল শোনা গেল তাঁর প্রয়াণের পরপরই, তার কতটুকু অবশেষ হিসেবে থেকে যাবে অনাগত আগামীতে, সে বিষয়ে সন্দেহের তীর ছোঁড়া থেকে আপাতত বিরত থাকলাম। যাই হোক, সম্ভাব্য পাঠকদের অকারণ বাড়তি কৌতূহল সৃষ্টি না করে এখনই নিবেদন করছি যে, ওপরে এমিলি ব্রন্টির যে বিখ্যাত উপন্যাসের কথা উল্লেখ করেছি, তা ঠিক ধান ভানতে শিবের গীত নয়। বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান প্রধান বিচারক থেকে অবসর নেবার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদের গুরু দায়িত্ব পালন করেন। সাধারণ্যে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ঘটেছে ওই পদের সূত্রেই।

কিন্তু তিনি যে তাঁর ব্যক্তিগত এবং ঐকান্তিক আগ্রহে বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন, সে সম্পর্কে অনেকে হয়ত অবহিত নন। লেখালেখির বিষয়ে বিচারপতি রহমান প্রায় অবিশ্বাস্য প্রাচুর্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। বিশেষত, প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনের পরবর্তী সময়ে।

কিন্তু বিচারপতির গুরুভার বহনের সময়ই তিনি বাংলা ভাষায় এমন একটি স্বতন্ত্র চরিত্রের গ্রন্থ রচনা করেন যে, শুধু সেটার কারণেই আমরা তাঁকে আবশ্যিকভাবেই মনে রাখতাম। *যথাশব্দ* নামের ওই বইটি হল বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম Thesarus। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ইংরেজিতে বহুল পরিচিত Roget-এর Thesarus-এর অনুসৃতিতে তিনি বাংলা ভাষায় সমার্থক শব্দের একটা অভিধান রচনার চেষ্টা করেছিলেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের অনেক পরে কোলকাতা থেকে *সংসদ সমার্থ শব্দকোষ* বেরিয়েছিল এবং ওই সংকলনের মূল অনুপ্রাণনা যে হাবিবুর রহমানের গ্রন্থটিই ছিল, সেকথা বোদ্ধা পাঠকদের বুঝতে অসুবিধা হয় না।

যথাশব্দ কিন্তু ঢাকার বুদ্ধিজীবী মহলে তেমন উল্লেখযোগ্য তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারেনি। বোধ হয় শুধু এই কারণেই যে, এর প্রণেতা বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রচলিত বুদ্ধিজীবী বৃত্তের মানুষ ছিলেন না। এই সূত্রে এটা উল্লেখ করতে চাই যে, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান তাঁর

কর্মজীবনের প্রারম্ভে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তী কালে তিনি আইন পড়াশোনায় মনোনিবেশ করেন এবং এই পেশাকে নির্বাচন করে তিনি শিক্ষকতায় ইস্তফা দিয়েছিলেন। কিন্তু আশির দশকেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের একজন শিক্ষক আমাকে বলেছিলেন, তিনি *যথাশব্দ* গ্রন্থটি সত্যজিৎ রায়ের পড়ার টেবিলে দেখেছেন। তাঁর ওই কথায় আমি প্রায় চমকে উঠেছিলাম।

বিচারালয়ের একজন মানুষ বাংলা ভাষায় Thesarus বা সমার্থ অভিধান তৈরি করেছেন, এটা ভাবলেই তো বিশেষ সমীহ জাগার কথা। এর জন্য যে আলাদা এবং প্রবল সদিচ্ছার প্রয়োজন, বাঙালিদের মধ্যে তার একটা ঐতিহাসিক ঘাটতি আছে, যে ভাবনা ও সময় বিনিয়োগ করতে হয়, বিচারকের কাজের সব দেনা-পাওনা মিটিয়ে তা বরাদ্দ করা সাধারণভাবে বেশ কঠিন বলেই তো মনে হয়। আর তারপরও এমন একটা শ্রমঘন ও নেশানিবিড় কাজ তার যোগ্য সমাদর পেল না, অন্তত প্রথম সংস্করণের ক্ষেত্রে।

যথাশব্দ প্রণয়নের মাধ্যমে বিচারপতি হাবিবুর রহমানের যে পরিচয়টা মুখ্য হয়ে ওঠে, তিনি যে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নন, তার প্রমাণ মিলেছে অচিরেই। খুব দ্রুতই আমরা আবিষ্কার করলাম যে, এই মানুষটি রবীন্দ্রসাহিত্যের এক অসামান্য ও জিজ্ঞাসু পাঠক। মাতৃভাষায় শিক্ষা ও এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের বিভিন্নমাত্রিক প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করে তিনি যখন একটি গ্রন্থ প্রকাশ করলেন, তখনই ঢাকার বিদ্বৎসমাজ একটু নড়েচড়ে বসল। তাদের ভাবনায় এমন একটা তরঙ্গ সৃষ্টি হল যে, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের অবস্থানকে আর উপেক্ষা করা যাবে না। গ্রন্থকারের ঝোঁকটা যে গবেষণা অভিমুখী, সেকথার সাক্ষ্য মিলল আবার। আইন ও বিচার অঙ্গনে বিচরণকারী এই মানুষটি রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অন্য একটি ভিন্ন স্বাদের বই লিখলেন। রবীন্দ্রনাথের রচনায় আইন-আদালত বিষয়ে যেসব প্রসঙ্গ এসেছে, তার এক অসাধারণ জরিপ হাজির করলেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বহু বিচিত্র বিষয়ে গ্রন্থ লেখা হয়েছে, যার মধ্যে অনেক সময় শুধুই ভিন্নতা সৃষ্টির একটা দুর্বল প্রয়াস থাকে, অন্তঃস্থিত শক্তির তেমন সন্ধান মেলে না। একটা কৌতুকের কথা মনে পড়ে গেল, কোলকাতার একটা নামী-দামী সংস্থা থেকে একটা বই প্রকাশিত হয়েছিল, যার শিরোনাম- *রবীন্দ্রনাথ কেমন করে লিখতেন*। এটা বেরোনোর পর সাহিত্যিক আড্ডায় এমন রসালোচনা হয়েছে যে, এরপর হয়ত কেউ লিখবেন, এই মহাকবি কিভাবে হাসতেন বা কাশতেন প্রভৃতি শিরোনামে। যাই হোক, হাবিবুর রহমানের গ্রন্থ থেকে অবশ্য সত্যিই রবীন্দ্ররচনার একটা ব্যতিক্রমী জায়গার দরকারী খোঁজখবর ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। যার মধ্যে শুধুই যে কিছু তথ্যনির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত তা নয়, সাহিত্যের পাতায় কিভাবে বৈষয়িক অনুষঙ্গের সংযোগ বাস্তবতা ও জীবনদর্শনকে সম্মিলিত করে তার এক চমৎকার আলোচনা রয়েছে এই গ্রন্থে।

রবীন্দ্রনাথ নিয়ে তাঁর উৎসাহ যে বহুবিস্তারী ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় আরো অনেকগুলি রচনায় এবং আমার মধ্যে এমন একটা প্রতীতি জন্মেছে, যেসব বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তীয় অধ্যাপককুল রবীন্দ্রভাবনার প্রসঙ্গটাকে একান্তই তাঁদের ঘোরাফেরার জায়গা বলে একটা আধিপত্যের মগ্নতার মধ্যে আবিষ্ট ছিলেন, তারা এখন সত্যিকারের প্রজ্ঞার সঙ্গে হাবিবুর রহমানের রবীন্দ্রপাঠকে স্বীকৃতি দান করতে আর কার্পণ্য করবেন না। তাঁর রবীন্দ্রপাঠ সত্যিই আমাকে মুগ্ধ করেছে, বিনয়ের সঙ্গে উল্লেখ করতে চাই তিনি আমার মত এক অভাজন ব্যক্তির রবীন্দ্রপঠনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছেন। একজন মানুষ তো তখনই সত্যি সার্থক, যখন তিনি অন্যের ভাবনাকে আলোড়িত করেন। আমাদের রবীন্দ্রচর্চার ইতিহাসে হাবিবুর রহমানের অবদান আবশ্যিকভাবেই অনস্বীকার্য।

তাঁকে নিয়ে কোন আলোচনা এমন একটা স্বল্পপরিসর নিবন্ধের মধ্যে ধারণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু কোথায় যে তিনি অর্থবহভাবে স্বতন্ত্র সেই কথাটা একটু উল্লেখ করতে চাই। উভয় বঙ্গকে অন্তর্ভুক্ত করেই সাধারণ একটা অভিমত প্রদান করা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁরা প্রচলিত নিরিখে উদারনৈতিক ভাবনায় বিশ্বাসী। এবং এই উদারপন্থায় সাধারণভাবে আমরা ধর্মবিশ্বাস থেকে একটা দূরত্বের বিষয়কে চিহ্নিত করার চেষ্টা করে থাকি। পূর্ববঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে এমন অবস্থান আরো বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, কারণ পাকিস্তান শাসনামলে ইসলামী ভাবধারা প্রচার ও প্রসারের কর্মসূচির মধ্যে রবীন্দ্র বিরোধিতার প্রসঙ্গ প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। স্মরণ করতে পারি, ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীর কালে পাকিস্তান কী নগ্নভাবে বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছিল। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আকর্ষণ ও অনুরাগের সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার একটা আবশ্যিক যোগ থাকে আমাদের দেশে। সাধারণ অভিজ্ঞতা এই কথাই বলে যে, উভয় বাংলার রবীন্দ্রগবেষকবৃন্দের সিংহভাগই স্বাভাবিক ধর্মাচারে তেমন আগ্রহী নন। ব্রতপালন, আনুষ্ঠানিক আচার-আচরণ যা হিন্দু ধর্মের প্রত্যক্ষতা নির্দিষ্ট করে অথবা ইসলাম ধর্মের নির্দেশনা অনুযায়ী নিত্য পাঁচ বার প্রার্থনা ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে এমন গবেষক, গায়ক, শিল্পী বা অনুরাগীদের সম্পর্ক দৃশ্যমানভাবেই ক্ষীণ।

কিন্তু হাবিবুর রহমান ছিলেন এক অনন্য ব্যতিক্রম। তিনি গভীর বিশ্বাসে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন। আবার একই সঙ্গে মন ও মননের আধুনিকতা এবং জীবনের বিভিন্ন আধুনিক অনুষঙ্গের সঙ্গে অত্যন্ত কার্যকর সংযোগ ঘটাতে সমর্থ ছিলেন। এই কথাটা এখানে তুললাম এই জন্য যে, তিনি যেমন ইসলামকে তাঁর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অংশ করে তুলেছিলেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্য দিয়ে এই মহামানবিক মনের সঙ্গলাভও

ছিল তাঁর নিত্যদিনের অনুশীলনের অনুষঙ্গ। রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁকে অনুসরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পাই, তিনি বাংলা ভাষায় কোরাণ শরীফের সাবলীল অনুবাদ করেছেন। অনেকের মতে, বাংলায় অনূদিত তাঁর কোরাণই সবচেয়ে সুপাঠ্য। এই তথ্যের দ্বারা আমি কিন্তু তাঁর ইসলাম ধর্ম বিষয়ে অনুরাগ প্রমাণ করতে চাইছি না। বোঝাতে চাইছি, তাঁর উদারভাবনার জগতটা কতটা সুদূরপ্রসারী। আরো বোঝাতে চাইছি যে, ভাষা এবং বাংলা ভাষায় অনুবাদ বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও ব্যুৎপত্তির কথা।

এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একবার কথোপকথনের সুযোগ হয়েছিল আমার। আন্তরিক প্রচেষ্টায় তিনি আরবী ভাষা রপ্ত করেছিলেন। বাংলাদেশে প্রাপ্তব্য কোরাণের একাধিক বাংলা অনুবাদ তিনি নিবিড়ভাবে পাঠ করেছিলেন। ইংরেজি ভাষায় অনূদিত, প্রামাণ্য ও জনপ্রিয় ভাষ্যের কোরাণের অনেকগুলি সংস্করণ মন দিয়ে তিনি পড়েছিলেন অনুবাদক হিসেবে যথাযথ প্রস্তুতি নেবার জন্য। বিশেষত, তিনি নির্ভর করেছিলেন আল্লামা মোহাম্মদ ইউসুফের ভাষ্যের ওপর। এমন পরিশ্রম তিনি করেছিলেন শুধু একটি বিশ্বস্ত, সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য অনুবাদ নির্মাণ করার জন্য। তাঁর একাগ্রতা, গবেষণার প্রতি অনুরাগ এবং একনিষ্ঠতার ছাপ শনাক্ত করা যায় এই অনুবাদের মাধ্যমে। এমন একটা মন্তব্য নেহাতই অহেতুক হবে না যে, *যথাশব্দ* প্রণয়ন করে তিনি যে বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছিলেন, বাংলায় কোরাণ অনুবাদের মধ্যেও তাঁর সেই স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠেছে।

আমি তাঁকে যতটুকু দেখেছি, তা থেকে তাঁর বিষয়ে সিদ্ধান্তসূচক বা সমাপনীমূলক কোন অভিমত প্রদান করতে পারি, সেই দাবি করব না। কিন্তু পরিচয়ের পর থেকেই তো নীরবে তাঁকে অনুসরণ করেছি। *যথাশব্দ* রচনার মধ্য দিয়ে ভাষা বিষয়ে তাঁর দুর্বলতার বিষয়টা প্রকাশ পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমার এমনটাই মনে হয়েছে যে, ১৯৯৯ সালে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার বিষয়টি বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে বিশেষভাবে তাড়িত ও প্রণোদিত করেছিল।

অত্যন্ত স্বাভাবিক ও যৌক্তিক কারণেই এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, তিনি ছিলেন আমাদের গৌবরময় ভাষা আন্দোলনের একজন অগ্রণী সৈনিক। বিচিত্র হলেও এই সত্যি কথাটা তো মান্য করতেই হবে যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে তিনি সকলের কাছে যতটা পরিচিত, ভাষাসংগ্রামী হিসেবে তাঁর পরিচয়টা তুলনামূলকভাবে নিতান্তই গৌণ। একুশের ফেব্রুয়ারির গড়পড়তা আলোচনা সভায় হাবিবুর রহমানকে খুব উল্লেখযোগ্যভাবে স্মরণ করা হয় না। কিন্তু ওই ১৯৫২ সালে এবং তার আগে এই আন্দোলনের সকল পর্যায়ে তিনি ছিলেন এক অকুতোভয় ও একনিষ্ঠ কর্মী। তাঁর ডাক নাম ছিল শেলী। ছিপছিপে গড়নের ওই তরুণের একটি সাইকেল ছিল। সাইকেল নিয়ে সাংগঠনিক তৎপরতা চালানোর বিশেষ সুবিধাও ছিল। ভাষা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকাকে খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই। এবং ভাষা আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই ইঙ্গিতই প্রধান হয়ে ওঠে যে, এই তরুণ অনাগত কালে দেশ ও সমাজের নানান প্রগতিশীল আন্দোলন ও কর্মসূচিতে তাঁর যথাযথ ভূমিকা পালন করবেন। ইতিহাস একথার পক্ষেই ইতিবাচক সায় দেয়।

একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার ভেতর দিয়ে বিচারপতি হাবিবুর রহমান সম্ভবত তাঁর তরুণ বয়সী উদ্যম, উদ্যোগ এবং উত্তেজনার এক মূত-বিমূর্ত রূপ লক্ষ করেছিলেন। অদম্য আগ্রহ নিয়ে প্রায় মোহতাড়িতের মত তিনি খুঁজে বেড়াতে লাগলেন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান ও ভাষায় তাদের মাতৃভাষা নিয়ে রচিত কবিতা, গান বা রচনা। এজন্যও তিনি অমন পরিণত বয়সে যে পরিশ্রম করেছেন, তার তুলনা মেলা ভার। এরপর যে ক'বার বিদেশ গেছেন এমন রচনা খুঁজে পেতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। দেশে যেসব বিদেশীদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, এ বিষয়ে সাহায্য করার জন্য তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন। আমার মত নগণ্য ব্যক্তিদেরও নানা সময়ে তাগাদা দিয়েছেন। তাঁর এই শ্রমের ফসল বোধ করি আমাদের সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় সংযোজন। পুরোনো দুঃখটা আবার জেগে উঠে। এই একুশে ফেব্রুয়ারির বাংলাদেশে হাবিবুর রহমানের ঐকান্তিক শ্রম ও আন্তরিকতায় সংকলিত ও প্রণীত অসাধারণ এই গ্রন্থ নিয়ে আমাদের বুদ্ধিজীবী ও পাঠক মহলে তেমন আলোচনা পর্যালোচনা চোখে পড়েনি।

বহুবিচিত্র বিষয় নিয়ে লিখেছেন হাবিবুর রহমান। আদিতে ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন। পরিণত বয়সে তাই তিনি বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডের একটা নৃতাত্ত্বিক-ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। নীহাররঞ্জন রায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির বীক্ষণকে নতুনভাবে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি। এই মানুষটি আমার কাছে প্রবল এক বিস্ময়। আবশ্যিকভাবেই মনে পড়ে যায়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর পরই জাতির উদ্দেশে তাঁর অসামান্য ভাষণ। হয়ত আমজনতাকে তা তেমনভাবে উত্তেজিত করেনি, কিন্তু বোঝা যায়, একজন সরকারপ্রধান, বিদগ্ধ দেশপ্রেমিক, প্রাজ্ঞ বিচারক কী গভীর দৃষ্টিতে দেশের সমাজ, মানুষ, বর্তমান ও ভবিষতকে অবলোকন করতে সমর্থ। আরো বোঝা যায়, সেই সময়কার স্বদেশ ও গণসচেতনাকে ইতিহাসমুখী ও মৃত্তিকাসংলগ্ন ভাবনায় সমৃদ্ধ করতে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা শুধু তাঁর মত একজন প্রাজ্ঞ মানুষের চিন্তা থেকেই প্রসূত হতে পারে, শুধু কোন দক্ষ আমলার অভিজ্ঞতার দ্বারা তা রচিত হতে পারে না।

দেশের সমগ্র জনসাধারণের সঙ্গে তাঁকে হারানোর বেদনায় আমার ব্যক্তিগত শোক যুক্ত করছি।

শর্বরী আলোময়ী
শিক্ষক ও সংস্কৃতিকর্মী

শফি আহমেদ

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যেন ধ্বংস ও হিংসার বলি না হয়

প্রতি বছরের সূচনায় অথবা চলমান বর্ষের সমাপনী বিন্দুতে আমরা পরিচিত বা প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে কার্ড পাঠাই। প্রতি বছরেই আমাদের বার্তার মূল উদ্দেশ্য হল- সমাগত বছরে ব্যক্তি ও সমষ্টির শুভকামনা। ভাষায় একটু হেরফের করে নিই হয়ত বৈচিত্র্য আনার জন্য, কিন্তু কল্যাণ ও মঙ্গলকে আহবান জানানোর ভাবনার মধ্যে কোন তারতম্য থাকে না।

২০১৩ সালের বিদায় বেলায় অথবা ২০১৪ সালের আগমনী ধ্বনি শুরু হওয়ার কালে অমন শুভেচ্ছার বাণী আমরা পেয়েছিলাম, পাঠিয়েছিলাম। যেহেতু এমন শুভেচ্ছা জ্ঞাপন এখন শুধুই (?) এক ধরনের সৌজন্য বিনিময় এবং অনেক ক্ষেত্রেই পারস্পরিক সম্পর্ক নবায়ন করার একটা রীতিতে পরিণত হয়েছে, তাই ২০১৩ সালের শেষ প্রান্তে অথবা ২০১৪ সালের একেবারে শুরুতে যখন এমন কার্ড চালাচালি হয়েছিল আমাদের মধ্যে, তখন হয়ত ডাকপিয়ন, বার্তাবাহক বা কুরিয়ার সার্ভিসের লোকজনকে সেগুলি বিতরণ করার সময় বোমা ও ককটেলের আকস্মিক প্রচণ্ড শব্দে দিক-বিদিক ছোটাছুটি করতে হয়েছিল। এমন ভয়াবহ সামাজিক অস্থিরতার মধ্যেও নিশ্চয়ই সেসব কার্ডে লেখা ছিল, -নববর্ষে আপনার শুভ হোক, কল্যাণ হোক। এ যেন শুধুই এক সাম্বাৎসরিক আচার। ২০১৩ সালের প্রায় মাঝামাঝি থেকেই বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা-রাজনীতি-শিক্ষা-সংস্কৃতিচর্চা-গণতান্ত্রিক অনুশীলন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে কালো মেঘ আরো কৃষ্ণবর্ণ হয়ে উঠছিল, আগামী দিনগুলির জন্য যে ভয়াবহ শঙ্কা অপেক্ষা করছে, জাতি হিসেবে কিভাবে আমরা সেই সংকটের মোকাবেলা করব, কতটা পারব, তা নিয়ে আমাদের মধ্যে ঘোর অনিশ্চয়তা ক্রমবর্ধমান হচ্ছিল।

প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে রেষারেষি, ক্ষমতার দম্ভ প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা, সমাজে হিংসাশ্রয়ী রাজনৈতিক তৎপরতার জ্যামিতিক প্রবৃদ্ধি, অশালীন অশোভন শব্দের তীব্র কোলাহল, হুমকি ও প্রতিহুমকির ঝনঝনানি এবং এই সবের সঙ্গে ধর্মীয় রক্ষণশীল গোষ্ঠীর উন্মাদনাময় প্রচার, সরকার কর্তৃক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাত্রাতিরিক্ত (অপ)প্রয়োগ এবং তার বিপরীতে তাদের ওপর জঙ্গী মৌলবাদীদের হিংস্র আক্রমণ, অনিঃশেষ হরতাল, অবরোধ, বৃক্ষ-নিধন, রেলপথ-রাজপথ অকার্যকর করে তোলা ইত্যাদি সব মিলিয়ে সমগ্র বাংলাদেশ যেন হিংসার আসুরিক এক অচেনা ভূখণ্ড হয়ে উঠেছিল।

অক্টোবর মাস থেকেই হিংসা কত প্রকরণের হতে পারে, আঘাতের বস্তু ও ব্যক্তি কী নির্বিচার হতে পারে, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কত অমানবিক হয়ে উঠতে পারে, শিশুদের শিক্ষা, পরীক্ষা ও বিদ্যালয়সমূহ কত মূল্যহীন হয়ে উঠতে পারে ক্ষমতাশ্রয়ী লোভ ও রাজনীতির কাছে, সেসবের এক দানবিক প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে গেছে বাংলাদেশের সকল জনপদ, সকল জনগোষ্ঠী। আযানের আহবান অথবা কোরান-হাদীসের পবিত্র বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য মসজিদে যে মাইক স্থাপন করা হয়েছিল, শুধু ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টির জন্য তার হিংসাশ্রয়ী ব্যবহারের দৃষ্টান্তও দেখেছি আমরা।

হিংসার এই বহুমাত্রিক অনুশীলন বিশেষত বিগত বছরের শেষ তিন মাসে আমাদের জন্য এমনই এক নিত্যনৈমিত্তিক অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে উঠেছে যে, আমরা যেন প্রতি বছরের

ঝড়, বন্যা ও খরার সঙ্গে তুলনীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত একইভাবে অকারণ জ্বালাও-পোড়াও, বোমাবাজি, অগ্নিসংযোগ, পাথর নিক্ষেপ, দোকানপাটে হামলা ইত্যাদিকে নেহাতই আমাদের অবশ্যম্ভাবী নিয়তি বলে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। রক্তপাতে বীভৎস দেহ, পেট্রলবোমায় দগ্ধ মানুষের শরীরের অসহনীয় দৃশ্য, ভয়ার্ত মানুষের সন্ত্রস্ত ছোটাছুটি, সযত্নে গড়ে তোলা পথিপার্শ্বের অপূর্ব সবুজ বৃক্ষরাজির হননযজ্ঞ, দেশীয় থেকে বিদেশী সকল রকমের অস্ত্রের ব্যবহারে প্রকম্পিত রাস্তাঘাট, বাজার-হাট, অফিস-আদালত, জনবসতি, বাইরে থেকে বাড়ি না ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবারের সদস্যের আকস্মিক নিহত বা আহত হবার আশঙ্কায় হতবিহ্বল মা-বাবা-সন্তান, সহোদর এবং স্বজন, এক কথায় মানবাধিকারের এমন করুণ ভূলুণ্ঠিত অবস্থা সেই ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর আর কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বিচিত্র এক অন্ধকার ও অনিশ্চিত সময় পরিক্রমা করেছি আমরা। আরও বেদনার সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, যারা এমন সব ভয়াবহ শয়তানসুলভ নিষ্ঠুরতার প্রধান কুশীলব, রাজনৈতিক দলের সেইসব নেতা, পক্ষ এবং প্রতিপক্ষ উভয় দিক থেকেই এমন দাবি করছেন যে, এর সবকিছুই অনিবার্যভাবে ঘটছে দেশের জনগণের সামগ্রিক স্বার্থ(?) সংরক্ষণের জন্য।

আজ আমার অনুভবে দগ্ধ মানুষের পোড়া মাংসের দুর্গন্ধ টের পাচ্ছি, শহরের রাজপথ দিয়ে চলার সময় চারদিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হতে পারি না, বনজঙ্গলহীন রুক্ষ এই শহরের কোন গলির কোনা থেকে বেরিয়ে আসবে কোন শ্বাপদ বা আততায়ী। যেন প্রায় অনিবার্যভাবে স্মৃতির ভেতর বাদুড়ের ঝাপটানির মত হঠাৎ কাজী নজরুল ইসলাম কথা বলে ওঠেন, হিন্দু-মুসলমানের গালাগালিকে যিনি গলাগলিতে রূপান্তরিত করতে গিয়ে ব্যর্থতায় রুদ্ধবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ঠিকই একইভাবে নির্দিষ্টভাবে ধর্মীয় দু'টি আলাদা সম্প্রদায় না হলেও দু'টি প্রধান রাজনৈতিক শক্তি দেশে যে অসহ্য গালাগালি বা হানাহানি বা কাটাকাটির চেষ্টায় বেহায়ার মত প্রবৃত্ত, তা থেকে নিবৃত্ত করার কোন প্রয়াস বা কোন উপদেশ তো কোন কাজে লাগলো না। গভীর বেদনায় ও ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ করলাম ৫ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখে অথবা তার পরপরই দেশের ঠাকুরগাঁও থেকে অভয়নগর পর্যন্ত বহু জায়গায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর চরম নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে এবং সেই আক্রমণ ও হামলায় অংশ নিয়েছে দুই রাজনৈতিক পক্ষ ও প্রতিপক্ষের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানী পুলিশ ছাত্র-জনতার ওপর গুলি চালিয়েছিল। আজও সেই শহীদদের আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। গুলিচালনার ওই ঘটনায় সেদিনের আর এক অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ তরুণ মাহবুব উল আলম চৌধুরী লিখেছিলেন অমর এক কাব্যগাথা। তিনি লিখেছিলেন, 'আজ আমি কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি'। আমারও বলতে ইচ্ছে করছে প্রায় পুরোটা ২০১৩ সাল জুড়ে বাংলাদেশে যা ঘটলো, তার জন্য আমি শুধু কাঁদতে চাই না, নিহত বা আহত স্বজনদের সচিত্রসংবাদ আমি শুধু টেলিভিশনের পর্দায় বা সংবাদপত্রের পাতায় দেখতে চাই না, আমি এর প্রতিকার চাই, শাস্তি চাই, প্রতিবিধান চাই, বিচার চাই। যদিও ঠিক তখনই রবীন্দ্রনাথের ক্ষীণ কণ্ঠ শুনতে পাই, 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'। এ কোন প্রলয়ঙ্কারী সময়ের আবর্তন ও পুনরাবর্তনের আমরা প্রতিবাদহীন শিকার! কেন এমন যুক্তিহীন অন্ধকার, অকল্পনীয় নিষ্ঠুরতা, দিনের আলোকে মুছে দেওয়া মিশমিশে আঁধার, দিনমজুরের করুণ আত্মাহুতি, সম্পদের হানি, অসহ অগণিত কাকের অবিরত চিৎকার?

আজ যদি বন্ধু হুমায়ুন আজাদ বেঁচে থাকতেন, নিশ্চয়ই জবরদস্ত লজ্জা পেতেন। আহা, এখন থেকে দশ বছরেরও বেশি আগে হুমায়ুন লিখেছিলেন অথবা কাতর কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আমরা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম'? ক্ষমতায় থাকা, টিকে যাওয়া এবং একদা ভোগকৃত এবং বর্তমানে হারানো ক্ষমতার মসনদের সিঁড়ি দিয়ে ওঠার উদগ্র আশায় প্রায় পুরোটা ২০১৩ সাল জুড়ে আমরা যা দেখেছি, তার সাক্ষ্য ধারণ করা অজস্র

টেলিভিশন স্পট, রাস্তায় ও বাসে আগুন, গাড়ি ভাঙচুর, নিরীহ মানুষকে আঘাত, মেডিকেল কলেজের বার্ণ ইউনিট, লাইন থেকে ছিটকে পড়া রেলের বগি, দোকান-পাট বাড়ি-ঘরদোরের ভগ্নাবশেষ, স্বজন হারানো পরিবারের সদস্যদের আর্তি, আঘাতে রাস্তায় ঢলে পড়া পুলিশের ওপর ক্রুর আক্রমণ, ককটেলের প্রক্ষেপণ ও সশব্দ বিহার, স্কুলযাত্রী শিশুর ওপর বোমার আক্রমণ, -এইসব যদি কোন সুস্থ মানুষ একত্রে দেখতে থাকেন, তা হলে নিশ্চিতভাবেই তিনি অচিরে বিকারগ্রস্ত হয়ে উঠবেন।

এমন সব স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়েই আবার ভয়ে শিহরিত হয়ে উঠছি। বাংলাদেশের মত ছোট এবং গবির জনপদের একটি দেশে দুই অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরাশক্তির দ্বৈরথ দেখে শুনে আমরা অদ্যাবধি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। জানি না, দেশ ও সমাজ কোন পথে যাচ্ছে। মাঝরাতে প্রায় সকল টেলিভিশন চ্যানেলের বাক্ প্রদর্শনী দেখে ও শুনেও ক্লান্ত আমরা। দ্বন্দ্ব ও সন্ধির মূলকেন্দ্রটা কোথায় তা নিয়ে সুনির্দিষ্ট করে কথা বলার মানুষ নিতান্তই দুর্লভ। যা প্রায়শই দেখতে পাই, তা হল অতীব নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্য এবং প্রকটিত বাকপটুদের নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থানুসন্ধান ও আনুগত্য, বাগাড়ম্বর ও পুনরাবৃত্তি। আচ্ছা, সবাই মিলে, মানে আমি এ বাড়ির, উনি ও বাড়ির, আমি বাঙালি, উনি বাংলাদেশী, আমি বাম দিক দিয়ে হাঁটি, উনি হাঁটেন ডান দিকে, আমি নারীর সমতা ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, উনি নারীর গৃহবন্দী অবস্থাকে সমর্থন করেন, এমন সব বিরোধী অবস্থানের পরও আমরা দু'জনা, প্রতিপক্ষ দু'জন, ক্ষমতার লোভী দু'জন, দেশটাকে নিজের বলে দাবি করা দু'পক্ষ, সব তাতেই একে অপরের দোষ খুঁজতে পরিপক্ক দুই দল অথবা আরো যেসব খুচরো দল একইভাবে ক্ষমতার ভাগাভাগিতে অংশগ্রহণ করার জন্য যাবতীয় কৌশলকে কখনো টাকার এ পিঠ, আবার কখনো ওপিঠ বলে গণ্য করতে সিদ্ধকাম, আমরা সবাই মিলে কি কতিপয় মৌলিক বিষয়ে নিজেদের ক্ষুদ্র ও কুটিল স্বার্থকে পাশে সরিয়ে রেখে নিজেদের অবস্থানকে স্পষ্ট করে তুলতে পারি না? সবাই মিলে কি বলতে পারি না যে, বোমাবাজির প্রস্তুতি ও কার্যক্রমের যে কারণেই থাকুক না কেন, আমরা শিশুদের বিদ্যালয়কে বোমার লক্ষ্যবিন্দু হিসেবে নির্দিষ্ট করব না এবং অবশ্যই শিশুদেরও নয়, এবং তাদের পিতা-মাতা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী বহনকারী রিক্সা বা অন্য যানবাহনকে আমরা রেহাই দেব।

ভাবতে যুগপৎ কষ্ট ও অবাক লাগে যে, আমরা এখন একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক অতিক্রম করছি। সমকালের সঙ্গে মধ্যযুগের দূরত্ব প্রায় আট শ' বছরের মত। অথচ ২০১৩ সালের বিশেষত, শেষ ছয় মাসে বাংলাদেশ যে সামাজিক অস্থিরতা, মাৎস্যন্যায়, হানাহানি, রক্তপাত ও শক্তি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করেছে, তাতে মনে হতে পারে আমরা মধ্যযুগীয় কালের নৈতিকতাবর্জিত, সহনশীলতাবর্জিত ও সভ্যাচরণবর্জিত একটা অরাজক সময়ের নিষ্ক্রিয় সাক্ষী।

২০১৩ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে গোঁড়া ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠী একটা বিশাল সমাবেশের মাধ্যমে নারীর প্রাপ্য স্বাধীনতার বিপক্ষে এবং গণতন্ত্রচর্চার বিরোধী এমন এক জেহাদী দাবিনামা ওরফে ফতোয়া জারি করে, তাতে মনে হয়, কোন একটি বিশেষ ধর্ম-বিশ্বাসের অপব্যাখ্যা দ্বারা কোন বিশেষ গোষ্ঠীর সর্বৈব ও একচেটিয়া আধিপত্য ব্যতীত বাংলাদেশের আদি কোন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা বা ঐতিহ্যের অস্তিত্ব ছিল না বা থাকবে না। দুই প্রতিপক্ষীয় এবং সহিংস রাজনৈতিক শিবিরের মধ্যে ক্ষমতালিপ্সার জন্য যখন যুদ্ধের দামামা বাজছে, তখন মৌলবাদী গোষ্ঠীর এমন জঙ্গী সমাবেশ ও ঘোষণা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মধ্যযুগের কথা মনে করিয়ে দেয় এই গণতন্ত্রকামী আধুনিক বাংলাদেশ।

এ যেন সেই বাংলাদেশ নয় যার স্বাধীনতার ধারণাটা গড়ে ওঠেছিল সকল নাগরিকের সমতাভিত্তিক ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই গর্জে ওঠা দিনগুলির দু'টি অর্থবহ পোষ্টারের কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে যায়; তার একটিতে আঁকা ছিল সশস্ত্র নারীর প্রতিকৃতি আর তাতে লেখা ছিল 'বাংলার মায়েরা, বাংলার মেয়েরা, আমরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা'। আর একটি পোষ্টারে খচিত বাণী ছিল এরকম 'বাংলার হিন্দু, বাংলার খ্রিস্টান, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলমান, আমরা সবাই বাঙালি'। অমন সব সমতাসূচক, সৌহার্দ্যমূলক, অন্তর্ভুক্তিপ্রবণ ধারণা এবং বাণীকে হৃদয়ে ধারণ করেই তো আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা অকুতোভয় দর্পে পাকিস্তানী সৈন্যদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল। অমন বাণীর ভবিষ্যৎ বাস্তবায়নের জন্যই তো লাখো মুক্তিযোদ্ধা আত্মত্যাগ করেছিলেন একটি ন্যায্য, ধর্মীয় গোঁড়ামি বিবর্জিত, শিক্ষিত ও আধুনিক সমাজ বিণির্মাণের অদম্য আশায়।

কিন্তু ২০১৩ সালে এ কোন বাংলাদেশে ছিলাম আমরা, ভয়বিহ্বলতা ও বন্যতায় বৃত্তাবদ্ধ হয়ে, শুধুই আঁধারের অপশক্তি অবলীলায় আবাহন করার জন্যে? বোধ হয়, ধর্মীয় মৌলবাদের প্রতিবাদে মনের ভেতরটা হঠাৎ করেই এক চমকে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল একাত্তরের সেই সংগ্রামী রক্তঝরা দিনগুলিতে। তাই ২০১৩ সালের সহিংস রাজনৈতিক আন্দোলনের আঘাতে ভেঙে পড়া আমাদের শিক্ষাঙ্গনের কথা বলতে গিয়ে কিছুটা অবিন্যস্তভাবে স্মৃতিভারাক্রান্ত ও আবেগবাহিত হয়ে গেছি।

কোদালকে কোদাল বলার সুস্পষ্ট রীতিতে সংক্ষিপ্ত আকারে এখন ক্ষোভের কথাটা প্রকাশ করার চেষ্টা করছি। গণতান্ত্রিক অধিকার,-এমন এক প্রায় অনস্বীকার্য দাবির সপক্ষে হরতাল নামক এক রাজনৈতিক কিন্তু শেষ বিচারে সামাজিকভাবে অনভিপ্রেত কর্মসূচিকে দেশের ছোট বড় সব রাজনৈতিক দল আইনানুগ ও অনিবার্য একটা প্রথা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অন্যান্য অনেক গণতান্ত্রিক দেশেও এর প্রচলন দেখা যায়। বিশেষত পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র আমাদের প্রতিবেশী ভারতেও তার প্রয়োগের সাক্ষ্য পাওয়া যায় মাঝে মাঝে। এমন সহিংসতা, হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞের পরও বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলসমূহের এই অধিকার অপ্রতিহত এবং অব্যাহত থাকা উচিত বলে বহুসংখ্যক মানুষ মত প্রকাশ করে থাকেন। তবে একথাও তো মানতে হবে, এমন কর্মসূচিতে যদি সাধারণ মানুষের ব্যাপক সমর্থন থাকে সেটা গ্রহণযোগ্য বিষয়। কিন্তু হরতাল যদি জনজীবন বিপর্যস্ত করে দেয়, অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তার মধ্যে যদি ব্যাপক ধ্বংসক্রিয়ার সম্ভাবনা বা দৃষ্টান্ত থাকে, তা হলে তা কোন হিতকর রাজনৈতিক কর্মসূচি হয়ে উঠতে পারে না।

২০১৩ সালের বাংলাদেশে দিনের পর দিন হরতাল আহ্বান করা হয়েছে। এমন সব দিনে হরতাল ডাকা হয়েছে, যার মধ্যে অনেকগুলি দিনে সারা দেশের বিভিন্ন স্কুলে পাবলিক পরীক্ষা হবার কথা। এসব পরীক্ষার দিনক্ষণ অনেক আগেই ঘোষণা করা হয়ে থাকে। আমাদের শিশু শিক্ষার্থীরা ভাল ফলাফলের আশায় দীর্ঘদিন ঘরে প্রস্তুতি নিতে থাকে। শিক্ষামন্ত্রী আকুল হয়ে আর্ত স্বরে আবেদন করেছেন বার বার, জাতীয়ভাবে অনুষ্ঠিতব্য দিনগুলিকে যেন হরতালমুক্ত রাখা হয়। দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক সমাজ ও শিক্ষার্থীরা বিবৃতির মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে আহ্বান জানালেন রাজনৈতিক শক্তির কাছে। দেশের স্বার্থে, শিক্ষার্থীদের স্বার্থে ও ভবিষ্যতের স্বার্থে যেন এমন কোন কর্মসূচি দেয়া না হয় যাতে শিক্ষাব্যবস্থা পর্যদুস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু এমন আবেদনে কোন সাড়া মেলেনি।

২০১৩ সালের বাংলাদেশে দিনের পর দিন হরতাল আহ্বান করা হয়েছে। এমন সব দিনে হরতাল ডাকা হয়েছে, যার মধ্যে অনেকগুলি দিনে সারা দেশের বিভিন্ন স্কুলে পাবলিক পরীক্ষা হবার কথা। এসব পরীক্ষার দিনক্ষণ অনেক আগেই ঘোষণা করা হয়ে থাকে। আমাদের শিশু শিক্ষার্থীরা ভাল ফলাফলের আশায় দীর্ঘদিন ঘরে প্রস্তুতি নিতে থাকে। শিক্ষামন্ত্রী আকুল হয়ে আর্ত স্বরে আবেদন করেছেন বার বার, জাতীয়ভাবে অনুষ্ঠিতব্য দিনগুলিকে যেন হরতালমুক্ত রাখা হয়। দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক সমাজ ও শিক্ষার্থীরা বিবৃতির মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে আহ্বান জানালেন রাজনৈতিক শক্তির কাছে। দেশের স্বার্থে, শিক্ষার্থীদের স্বার্থে ও ভবিষ্যতের স্বার্থে যেন এমন কোন কর্মসূচি দেয়া না হয় যাতে শিক্ষাব্যবস্থা পর্যদুস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু এমন আবেদনে কোন সাড়া মেলেনি। শিশু শিক্ষার্থীদের (এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষার্থীদের বেলায়ও একথা প্রযোজ্য।) পরীক্ষার দিন বার বার পরিবর্তন করতে হল। প্রবল হতাশা নিয়ে নিষ্ক্রিয়ভাবে শিক্ষাব্যবস্থার এই চরম দুরাবস্থা দেখে যাওয়া ছাড়া জনসাধারণ ও অভিভাবকদের জন্য কোন উপায়ান্তর ছিল না।

এমন কি বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছিল, দেশে অনুষ্ঠিতব্য কিন্তু বিদেশ থেকে পরিচালিত পরীক্ষাসমূহের কার্যক্রম যেন ব্যাহত না করা হয়। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য কিছুটা শিথিলতার আন্তরিকতা বিবর্জিত আশ্বাস পাওয়া গেলেও তা কার্যকর হতে পারেনি। কারণ মানুষ তখন বাসের ভেতর পেট্রল বোমার আঘাতে নিহত ও আহত হচ্ছে, ককটেল নামের এক ভয়াবহ অস্ত্র তখন খেলনার মত সুলভ হয়ে উঠেছে, ককটেলের আঘাতে স্কুলগামী এক ছাত্র তার একটি চোখ হারিয়েছে। রাজনৈতিক শক্তি, যারা দেশ শাসনে অত্যুৎসাহী, তারা শিক্ষার জন্য এমন একটা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, এই আধুনিক যুগে, সেকথা মানতে কষ্ট হয়।

২০১৪ সাল যখন দরজায় কড়া নাড়ার পর সত্যিই এসে গেল, ততদিনে হিংস্রতার ব্যাপকতা ও গভীরতা উভয়ই পরম আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং তার বিপরীতে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সর্বতোভাবে বাধা দিয়ে নিজেদের শক্তি প্রকাশের এক প্রবল যুদ্ধে নেমে পড়লো রাজনীতির নিয়ন্ত্রকবৃন্দ। নির্বাচনের প্রক্রিয়ার মধ্যে গণতান্ত্রিক আচরণের প্রতিফলন ঘটছে না, এমন দাবির সপক্ষে বহু মানুষের সায় ছিল, তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। কিন্তু সেই কথাটা প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তিবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিবর্তে এমন সব ধ্বংসমুখী নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালানো হল, যার মধ্যে গণতান্ত্রিক আচরণের লেশমাত্র রইল না। দেশের শাসকগোষ্ঠীর প্রতিপক্ষ ও বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার জন্য জনসাধারণকে আদর্শিক

ও নৈতিকভাবে উজ্জীবিত ও পরিচালিত করতে পারত, তা হলে হয়ত দেশব্যাপী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংঘটনের কোন প্রয়োজন পড়তো না। কিন্তু তা হয়নি।

এসব কথা আমাদের সকলের জানা। নতুন বছরের, ২০১৪ সালে জানুয়ারি মাসের পাঁচ তারিখে বাংলাদেশে দশম সংসদ গঠনের উদ্দেশ্যে জাতীয় নির্বাচন হয়। আহা, কী ভয়ঙ্কর শুরু এই নতুন বছরের। গালাগালি, ইট পাটকেল নিক্ষেপ, ককটেল-মলোটভের বিস্ফোরণ, পিস্তল-রিভলভারের দ্বন্দ্বযুদ্ধ, দা-কুড়ালের রক্তারক্তি প্রাপ্তব্য এমন সব হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডের প্রকাশ ও প্রসার ঘটতেই থাকল। এইবারের জাতীয় নির্বাচন কোন অর্থেই সকলের অংশগ্রহণমূলক নয়, অতএব তা বর্জনীয়। এমন নিখাদ কথাও মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। আহা রে, গণতান্ত্রিক দেশে এমন এক রাজনীতির ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছি আমরা।

চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী আমাদের দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। জাতীয় নির্বাচনে মানুষ যাতে ভোট দিতে আসতে না পারে এমন একটা প্রতিবাদী -প্রতিরোধী কর্মসূচিকে সফল করার অনেকগুলি উপায় বা বিকল্প বিরোধী দল বা জোটের কাছে ছিল। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ পন্থাটাই গ্রহণ করা হল। ভোটের আগে বা নির্বাচনের দিনে বিদ্যালয়ে আগুন দেয়া হল, ধ্বংস করা হল স্কুলের আসবাব, শিশুদের বসার বেঞ্চি, চেয়ার, টেবিল, বোর্ড; বোমায় উড়ে গেল স্কুলের ছাদ। টেলিভিশনের সামনে অসহায় আমরা বসে বসে দেখেছি আমাদের শিক্ষালয় পুড়ে যাচ্ছে, নতুন পাওয়া পাঠ্যপুস্তক আগুনে পুড়ছে, আমাদের স্বপ্ন পুড়ছে। দুর্বৃত্তদের এই অবিবেকী কর্মকাণ্ডে যে রাজনৈতিক নেতাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সায় ছিল, সে বিষয়ে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই।

নানান সূত্রের তথ্য থেকে জানা গেছে তিন শতাধিক স্কুলভবনে আগুন দেয়া হয়েছিল। আমাদের এই দরিদ্র বাংলাদেশে! যে দেশে শুধু দারিদ্র্যের কারণেই কত মাতা-পিতা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারেন না এবং একই কারণে কত হাজার হাজার শিশু শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ঝরে যায়, সেখানে স্কুলভবনে অগ্নিসংযোগকে কি রাজনৈতিক কর্মসূচি বলে মেনে নেয়া যায়? গরিব দেশের কষ্টলভ্য এই পরিসম্পদের ক্ষতি কিভাবে পূরণ করা যাবে? বাংলার সংগ্রামী মানুষ বন্যার ছোবল থেকে উঠে দাঁড়ায়, নদী ভাঙনের শিকার হয়ে বাপ-দাদার ভিটেমাটি ছেড়ে আজীবনের জন্য উদ্বাস্তু হয়, সিডরের আক্রমণ থেকে শিক্ষা নিয়ে আবার নতুন করে বাঁচার বার্তা খুঁজে নেয়। তাই হয়ত দেশীয় পরিসম্পদ সংগ্রহ করে, আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাসমূহের আনুকূল্যে এইসব দগ্ধ পঙ্গু স্কুলের কাঠামো আবার নির্মাণ করা হবে, হয়ত কয়েক মাসের মধ্যে এইসব স্কুলের বিভিন্ন ঘর ও প্রাঙ্গণ শিশু শিক্ষার্থীদের কলকাকলিতে ভরে উঠবে।

কিন্তু হাজার হাজার শিশু যে দেখল, তাদের স্কুলে আগুন দেয়া হয়েছে, কেন তা করা হল, তার কোন সদুত্তর কি আমরা দিতে পারবো তাদের? হিংসার যে আগ্নেয় দৃষ্টান্ত তারা অবলোকন করল এই নবীন বয়সে, সেটাও কি কোন প্রলয়ঙ্করী সামাজিক অস্থিরতা ও অস্থিতাবস্থার শিক্ষা দেয়নি তাদের? স্কুলভবন, শিশু শিক্ষার্থী এবং পাঠ্যপুস্তকের প্রতি নগ্ন শত্রুতার এমন উদাহরণ হয়ত আমরা শুধু খুঁজে পাই সেই ১৯৭১ সালের রক্তাক্ত দিনগুলিতে। তার সঙ্গে না হয় আমাদের মত কিছু প্রৌঢ় বা প্রবীণের স্মৃতির বা অভিজ্ঞতার যোগ আছে। এইসব শিশুদের তো নেই।

২০১৪ সালের এইসব শিশুদের এ কোন বিষাক্ত দৃশ্যের দর্শক করলাম আমরা। আমাদের নিলর্জ্জতা, নিষ্ক্রিয়তা, অনুভবহীনতা ও দূরদর্শিতার অভাব ও নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য আমরা কি অন্তত অনুতপ্ত হব না? বিবাদের যত গভীর কারণই থাকুক, শিক্ষাব্যবস্থা ও তার গতিশীলতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য কি আমরা আমাদের দায়বদ্ধতা স্বীকার করব না? শিক্ষাকে রক্ষার মত অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা রাজনৈতিকভাবে পক্ষ-প্রতিপক্ষ হয়েও কি জাতীয় ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারব না? না কি এই সমাগত জানুয়ারিতে অথবা বছর দূরত্বের শুভেচ্ছা কার্ডে আমরা লিখব-আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যেন আগুনের লেলিহান শিখা থেকে মুক্তি পায়?

শফি আহমেদ
অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সচিত্র শিক্ষা সংবাদঃ জানুয়ারি ২০১৪

পাঠ্যপুস্তক বিতরণ উৎসবে শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ

সৌজন্যেঃ *প্রথম আলো*

সৌজন্যেঃ *প্রথম আলো*

ফলাফল ঘোষণার পর উচ্ছ্বসিত সফল জেএসসি পরীক্ষার্থীরা

জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপর সহিংসতার খণ্ডচিত্র

সৌজন্যে: *প্রথম আলো*

সৌজন্যে: *প্রথম আলো*

সৌজন্যে: *প্রথম আলো*

সৌজন্যে: *সমকাল*

সৌজন্যে: *সমকাল*

সৌজন্যে: *প্রথম আলো*

সৌজন্যে: *প্রথম আলো*

সৌজন্যে: *প্রথম আলো*

নির্বাচন প্রতিহতের অংশ হিসেবে রাজশাহীর চারঘাট এলাকার কালাবীপাড়া আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ে গত শুক্রবার গভীর রাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ভোটকেন্দ্রের তালিকায় বিদ্যালয়ের নাম থাকায় এ নাশকতা ঘটে বলে মনে করছে এলাকাবাসী

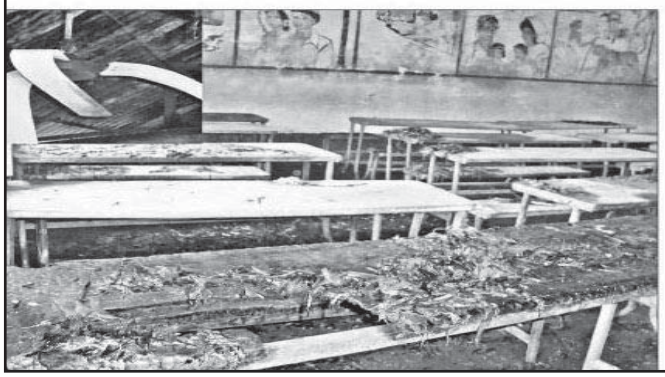

সৌজন্যে: *প্রথম আলো*

সৌজন্যে: *প্রথম আলো*

সৌজন্যে: *সমকাল*

সৌজন্যে: *প্রথম আলো*

সৌজন্যে: *সমকাল*

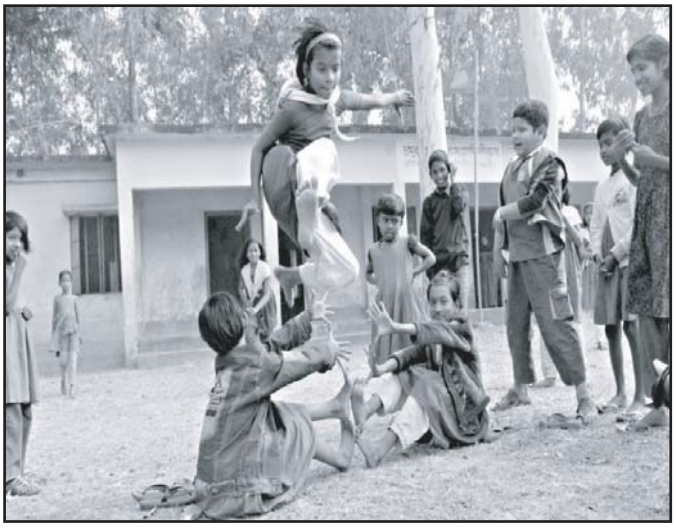

সৌজন্যে: *প্রথম আলো*

সৌজন্যে: *প্রথম আলো*

সিরাজুদ দাহার খান

সংলাপঃ একটি কিশোরী-ক্ষমতায়ন পন্থা

১. সংলাপ কি এবং কেন

না, এটি কোনো রাজনৈতিক সংলাপ নয়। নয় কোনো দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিবদমান রাজনৈতিক দলের মধ্যে সমঝোতা ও ক্ষমতা ভাগাভাগির উদ্যোগ। কিশোরী মেয়েদের সচেতনায়ন, নিজস্ব জীবন-সমস্যা-সমাধান ও ক্ষমতায়নের জন্য এটি একটি ভিন্নধর্মী প্রয়াসঃ সংলাপ।

'সংলাপ' হলো কিশোরীদের আত্ম-সচেতনতা ও আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি এবং জীবনদক্ষতা অর্জনের একটি কিশোরী-বান্ধব ও সংলাপধর্মী ফলপ্রসূ প্রক্রিয়া; এ থেকে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কিশোরীরা তাদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়।'

'সংলাপ' হলো কিশোরীদের আত্ম-সচেতনতা ও আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি এবং জীবনদক্ষতা অর্জনের একটি কিশোরী-বান্ধব ও সংলাপধর্মী ফলপ্রসূ প্রক্রিয়া; এ থেকে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কিশোরীরা তাদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়।'

এই সংলাপে কিশোরীরা তাদের দৈনন্দিন জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা এবং তার সমাধানের উপায় চিহ্নিত করে, সে অনুযায়ী কাজ করে এবং কাজের ফলাফল নিয়ে পর্যালোচনা করে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করে থাকে। এভাবেই তারা তাদের সমস্যা সমাধান করে এবং ধীরে ধীরে ক্ষমতায়িত হয়; আত্মমর্যাদা ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন আত্মনির্ভরশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার সিঁড়িতে পা রাখে। সূচনা-পরবর্তী প্রথম পর্যায়ে এর নাম ছিল 'কিশোরী সংলাপ'। পরবর্তী কালে শুধু 'সংলাপ' নামে দেশে-বিদেশে এটি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।

বাংলাদেশের কিশোরী মেয়েরা জীবন ও জীবিকায় পিছিয়ে আছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, তাদের বিভিন্ন বিষয়ে আত্মবিশ্বাস, সচেতনতা ও দক্ষতার অভাব। এর মধ্যে মানবিক ও সামাজিক অধিকার, বয়ঃসন্ধিকালীন পরিচর্যা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতার অভাব ও অনীহা গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও, আর্থিক ও মানবাধিকার লঙ্ঘন তো রয়েছেই। অন্যান্য জনগোষ্ঠীর তুলনায় বাংলাদেশের দরিদ্র কিশোরীরা বেশি অনাদৃত। অথচ এরাই জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে। তাই, জাতির ভবিষ্যতের ভিত্তি শক্ত করতে হলে এই কিশোরী জনগোষ্ঠীকে আত্মসচেতন ও জীবন-দক্ষতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা খুবই জরুরি। এই পরিপ্রেক্ষিতে এক বছর মেয়াদী কিশোরী সংলাপ কার্যক্রমের উদ্ভাবন বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। আত্ম-নির্ভরতার লক্ষ্যে কিশোরীদের জীবন-সম্পৃক্ত বিষয়ে সচেতনতা, মৌলিক জীবন দক্ষতা ও আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে দক্ষতা অর্জন এর মূল অভীষ্ট। সংলাপ-প্রক্রিয়া থেকে অর্জিত জীবন-সচেতনতা ও দক্ষতা দৈনিন্দন জীবনে কাজে লাগিয়ে তারা নিজেদের স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক মর্যাদা, আর্থিক উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়ে থাকে। এই কার্যক্রমের ফলে কেবলমাত্র কিশোরীরাই উপকৃত হয় না, তাদের পরিবার পাড়া-প্রতিবেশী এলাকাবাসী প্রভাবিত ও উপকৃত হয় এবং তাদের ভবিষ্যত জীবন ঝুঁকিমুক্ত হয়ে ওঠবে। পরিবারে, সমাজে, নিজের সংসারে তাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা বাড়বে। কিশোরীরা সমাজে ও পরিবারে নানাভাবে নিপীড়িত ও বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে, তারা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বেশির ভাগ মেয়েই অনেক দরকারি বিষয় নিয়ে অন্যদের সাথে আলোচনা করতে পারে না। এ ছাড়াও তারা অবহেলার শিকার হয়। এ সকল বিষয়ে কিশোরীদের সচেতন ও তাদের সমস্যা সমাধানে করণীয় নির্ধারণে তাদেরকে উদ্যোগী করে তোলা দরকার। তাই, দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে কৈশোরে মেয়েদেরকে জীবন-সচেতন ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন হয়ে উঠতে এবং সমাজের গুণগত পরিবর্তনে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম করতে আলোচ্য সংলাপ-কার্যক্রমের ভূমিকা অত্যন্ত কার্যকর।

২. পূর্বকথা

১৯৯৩ সাল থেকে অ্যাকশনএইড ও তার পার্টনার সংগঠনগুলো 'রিফ্লেক্ট' নামে বয়স্কদের জন্য একটি ক্ষমতায়ন-কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে আসছে। অনেকের মতো স্ট্রম ফাউন্ডেশনের কোনো কোনো সহযোগী-এ ধারণাটিকে কিশোরীদের জন্য কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের সে প্রয়াসে তেমন সফলতা আসেনি। এমতাবস্থায় স্ট্রম ফাউন্ডেশনের এশীয় অঞ্চলিক পরিচালক জনাব নিমল মার্টিনাস তাদের সহযোগী সংগঠনে কিশোরীদের জন্য একটি নতুন ধরনের কর্মপন্থা প্রণয়নের আবশ্যকতা অনুভব করেন এবং প্রয়োজনীয় ধারণা ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরা রিফ্লেক্ট-এ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, পিআরএ, পাওলো ফ্রেইরির শিক্ষা দর্শন ও অংশগ্রহণমূলক

শিখনকলায় পারদর্শী কোনো একজন পরামর্শককে দিয়ে কাজটি সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে কারিগরি সহায়তার জন্য ২০০৬ সালের জুন মাসে এ নিবন্ধকার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন এবং তাঁর পূর্ব-অভিজ্ঞতার নির্যাস নিয়ে তিনি 'সংলাপ' নামে এই কর্মপন্থা রূপায়ণ করেন। এ জন্য তিনি কর্মশালার মাধ্যমে সহযোগী সংগঠনগুলোর মতামত গ্রহণ করেন এবং 'সংলাপ'-এর মূল প্রক্রিয়ার কাঠামো তৈরি করে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং পরবর্তীকালে মাঠ-অনুশীলনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তা চূড়ান্ত করেন।

প্রাথমিকভাবে প্রথম ৮ মাস কোনো উপকরণ ছাড়াই শুধুমাত্র প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে সহযোগী সংগঠনগুলো মাঠ পর্যায়ে এর বাস্তবায়ন শুরু করে এবং এতে উৎসাহব্যঞ্জক ফল পাওয়া যায়। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংলাপ-সঞ্চালক বা এনিমেটরদের জন্য ৩টি গাইড বুক প্রণয়ন করা হয়, যা সংলাপ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য অনুসরণ করা হয়। প্রথম দিকে 'কিশোরী সংলাপ' নামে মাঠ পর্যায়ে এর সফল বাস্তবায়ন করে RDRS, VARD, CODEC, COAST Trust, SUS, BURO Tangail, YMCA, POPI, MCIWO। পরবর্তী কালে আরও কিছু সংগঠন এতে যুক্ত হয়। মাঠ পর্যায়ে এটি বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়ায় সার্বিক ব্যবস্থাপনাগত সহায়তা দেন স্ট্রম ফাউন্ডেশনের এদেশীয় প্রধান জনাব যোয়েল এস দাশ এবং কারিগরি ও তাত্ত্বিক সহায়তা দেন নিবন্ধকার এবং ইন্টার‍্যাকশন-এর কর্মী-কুশলীবৃন্দ।

৩. সংলাপ সহায়িকা/নির্দেশিকা

অগেই বলা হয়েছে, 'সংলাপ' রূপায়ণ, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ পরিচালনা, এনিমেটরদের জন্যে গাইড প্রণয়ন ও মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং-এ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন ইন্টার‍্যাকশন ও তার কুশলীবৃন্দ। ব্যবস্থাপনাগত পর্যায়ে কর্মশালা, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, এনিমেটর প্রশিক্ষণ ও সঞ্জীবনী কর্মশালা ছাড়াও সংলাপ কেন্দ্র পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত ধারণা ও চাহিদার ওপর ভিত্তি করে এর নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়। এর ৩টি অংশ: প্রথম অংশ– 'সংলাপ পরিচালনা প্রক্রিয়া', দ্বিতীয় অংশ– 'সংলাপ ধারণাপত্র' এবং তৃতীয় অংশ– 'সংলাপ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা'। প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ প্রধানত সংলাপ এনিমেটর ও প্রশিক্ষকদের জন্য প্রণীত। আর তৃতীয় অংশ প্রণীত হয় ব্যবস্থাপকদের জন্য। প্রণীত নির্দেশিকায় মাঠ পর্যায়ের সংলাপের অভিজ্ঞতা সংযোজন করতে সহায়তা করেছেন মাঠকর্মী ও প্রথম ব্যাচে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষকবৃন্দ। পরবর্তী কালে সঞ্জীবনী কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে সেটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরখ করে দেখেছেন; এনিমেটদের উপযোগী করতে প্রয়োজনমাফিক যোগ-বিয়োগ করেছেন। 'সংলাপ ধারণাপত্র' ও 'সংলাপ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা' অংশ দুটো সংকলন ও গ্রন্থনা করেছেন ইন্টার‍্যাকশনের প্রোগ্রাম ম্যানেজার সাহানাজ পারভীন দৃষ্টি।

নির্দেশিকার দ্বিতীয় অংশ– 'সংলাপ ধারণাপত্র' গ্রন্থনার ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি, সেভ দ্য চিলড্রেন ইউএসএ, কোডেক, এনসিটিবি প্রকাশিত বই ও অন্যান্য প্রকাশনার সহায়তা নেয়া হয়েছে; বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে ছবি। তবে, বাস্তবে নির্দেশিকার মধ্যে বন্দী না থেকে এনিমেটর, প্রশিক্ষক ও ব্যবস্থাপকগণ বিভিন্ন ইস্যুতে সংলাপ-প্রক্রিয়া নিজেদের মত করে ব্যবহার করে থাকেন। অর্থাৎ যদিও এনিমেটরদের জন্য আছে সহায়ক নির্দেশিকাগুচ্ছ তবে নতুন নতুন প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীন।

৪. সংলাপের বিষয়

জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের জন্য ২০-২৫ জন কিশোরীদের নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ইতোমধ্যে গঠন করা হয়েছে ৩০০-র বেশি সংলাপ কেন্দ্র। এসব কেন্দ্রে নিজেদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানোর জন্যে কিশোরীদের নিজেদের মধ্যে সংলাপ হয়। এতে তথ্য বিনিময়ের জন্য যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হচ্ছে: বয়ঃসন্ধি, প্রজনন স্বাস্থ্য, প্রাথমিক স্বাস্থ্য যত্ন, এইচআইভি/এইডস/এসটিআই, পারিবারিক আইন (বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, যৌতুক, তালাক, বিয়ে-নিবন্ধন, জন্ম নিবন্ধন, পারিবারিক আদালত, সালিশ), নারী ও শিশু অধিকার, কুসংস্কার, নারী-পুরুষ সমতা, স্থানীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ ও দুর্যোগ, ইতিবাচক মূল্যবোধ ও সামাজিক সম্প্রীতি, প্রতিবন্ধিতা, এসিড-সন্ত্রাস, মেয়েদের উত্যক্তকরণ। এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে জীবন দক্ষতার ১০টি মূল উপাদান।

এতে সচেতনতা ও জীবনদক্ষতা অর্জনের পর কিশোরীদের ৩ মাসের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আইজিএ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে। প্রশিক্ষণ দেয়ার পূর্বে সম্ভাব্য বাজার, ব্যক্তিগত চাহিদা ও দক্ষতা যাচাই করে নেয়া হয়। সরকারি বিভিন্ন এজেন্সির সাথে সংযোগ সাধন করে বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। এ ছাড়াও কিছু প্রশিক্ষণার্থীকে সরকারি কোনো প্রশিক্ষণ কোর্সে পাঠিয়ে বিভিন্ন ধরনের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ হয় হাতে-কলমে এবং উৎপাদনমুখী। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণকালীন সময়ে ও পরে অর্থনৈতিক সহযোগিতা দেয়া হয়। দক্ষতা ও অর্থ যাতে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে তার জন্যে থাকে প্রশিক্ষণ-উত্তর ফলোআপ কার্যক্রম; প্রদান করা হয় পরিকল্পিত সাংগঠনিক সহায়তা। মোট ১২ মাসের মধ্যে এর সচেতনতামূলক অংশের সময় ৯ মাস। সচেতনতামূলক সংলাপের মূল বিষয়গুলো অভিজ্ঞতা ও চাহিদার ভিত্তিতে পূর্ব-নির্ধারিত। তবে, তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে নতুন নতুন বিষয় বা ইস্যু নিয়ে সংলাপ বা আলোচনা পরিচালনা ও তার সমাধানে স্বাধীন পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটানো যায়। অভিভাবক ও সংলাপ সহায়ক টিমের সহায়তায় এনিমেটর দ্বারা সংলাপ কেন্দ্র পরিচালিত।

সংলাপ-এ IGA কার্যক্রম

সংলাপ-এ IGA কার্যক্রম নিয়ে দু'ধরনের ধারণা কেন্দ্র আছে। একটি কেন্দ্র সংলাপে ইস্যুভিত্তিক আলাপের পর্ব শেষ হলে কর্মসূচিতে IGA যুক্ত রাখার পক্ষে। আরেকটি কেন্দ্র IGA বিযুক্ত করার পক্ষে। দুটি চিন্তাকেন্দ্রের নিজস্ব যুক্তি আছে। প্রথম পক্ষের মূল যুক্তি হচ্ছে IGA সহায়তা না দিয়ে কিশোরীদেরকে যদি শুধু জীবন-সচেতন করে ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে তাদের আর্থিক ক্ষমতায়ন হবে না এবং ফলে ধীরে ধীরে তাদের সামাজিক ক্ষমতায়নের গতি ব্যাহত হবে বা লোপ পাবে। আর অন্যদের যুক্তি IGA থাকলে কিশোরীরা প্রধানত IGA সহায়তা পাওয়ার প্রণোদনায় সংলাপে সংযুক্ত থাকার চেষ্টা করবে। ফলে তাদের নিজস্ব সচেতনায়ন, কর্মতৎপরতা এবং পারিবারিক-সামাজিক সচেতনায়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে। যাহোক, এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ IGA-যুক্ত 'সংলাপ' পন্থাই প্রভাব বিস্তার করে আসছে।

৫. সংলাপ ব্যবস্থাপনা

সংলাপ বাস্তবায়নে পরপর অনেকগুলো কাজ করতে হয়। একটা ধাপ শেষ করে আরেক ধাপে পা রাখতে হয়। এক নজরে দেখার জন্য সমগ্র সংলাপ বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার ধাপসমূহ ধারাবাহিকভাবে নিচে দেওয়া হলো।

১. কর্ম এলাকা নির্বাচন ২. সুপারভাইজার ও সংলাপ এনিমেটর নির্বাচন ৩. সুপারভাইজার ও এনিমেটরদের সংলাপ প্রশিক্ষণ ৪. কমিউনিটি সম্পৃক্তকরণ ও সংলাপ সহায়ক টিম (এসএসটি) গঠন ৫. কিশোরী নির্বাচন ৬. কেন্দ্র ঘর নির্বাচন ও সংলাপের সময় নির্ধারণ ৭. উপকরণ সংগ্রহ/সরবরাহ ৮. সংলাপ কেন্দ্র উদ্বোধন ৯. অংশগ্রহণকারী কিশোরীদের বর্তমান KASH যাচাই ১০. বিষয়ভিত্তিক সংলাপ (৯ মাস) পরিচালনা ১১. কিশোরীদের অর্জিত KASH যাচাই ১২. সংলাপের বিষয়ভিত্তিক পাঠচক্র ও সাক্ষরতা দক্ষতার অগ্রগতি সাধন ১৩. আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ১৪. অংশগ্রহণমূলক মনিটরিং ও মূল্যায়ন। সব ধাপ শেষ করে নয়, অংশগ্রহণমূলক মনিটরিং প্রথম থেকেই নিয়মিতভাবে কার্যকর করতে হয় এবং ফরম্যাট অনুযায়ী তার প্রাপ্ত ফলাফল নথিবদ্ধ করতে হয়। প্রতি ৩ মাস পর পর কিশোরীদের অর্জন ও অগ্রগতি যাচাই করে নথিবদ্ধ করতে হয়। প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করে ঘাটতি পূরণের উদ্যোগ নিতে হবে। এনিমেটর ও সুপারভাইজার যৌথভাবে অংশগ্রহণমূলক মনিটরিং এবং ৯ মাস পর মূল্যায়ন পরিচালনা করবেন।

৬. সংলাপ-এ সংমিশ্রণ

সংলাপ একটি নতুন ধারা হলেও একেবারে মৌলিক নয়। প্রচলিত ৪টি দর্শন ও অ্যাপ্রোচের সংমিশ্রণে এটি রূপায়িত। সেগুলো হলো:

১. পাওলো ফ্রেইরির মুক্তকামী শিক্ষা দর্শন ও পদ্ধতি

২. পিআরএ বা পার্টিসিপেটরি রিফ্লেকশনস এন্ড অ্যাকশনস

৩. রিফ্লেক্ট

৪. মাইন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্রোচ (এমএমএ)

এগুলোর সংমিশ্রণে সংলাপ উদ্ভাবিত হলেও সংলাপ এগুলো থেকে স্পষ্টতই আলাদা এক পন্থা। সময়সীমা, প্রক্রিয়া, সংলাপের ধরন ও বিষয়– সব মিলিয়ে সংলাপ একটি নতুন অ্যাপ্রোচ বা প্যাকেজ। যা ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। নিচে উপর্যুক্ত ৪টি দর্শন ও অ্যাপ্রোচ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হলো।

পাওলো ফ্রেইরির শিক্ষা দর্শন– বিশ্ববিশ্রুত শিক্ষাদার্শনিক ব্রাজিলের পাওলো ফ্রেইরি মুক্তিকামী শিক্ষাধারার প্রবক্তা। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত নিপীড়িতজনের শিক্ষা (Pedagogy of Oppressed) নামক গ্রন্থে প্রতিফলিত ফ্রেইরির শিক্ষাদর্শন, বিশ্বব্যাপী আলোচিত, সমালোচিত ও সমাদৃত। তিনি প্রচলিত শিক্ষাধারাকে অপোষকামী বা পোষ-মানানো শিক্ষাধারা হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং বিপরীতে মুক্তিকামী শিক্ষাধারা প্রচলনের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন। পোষ-মানানো শিক্ষাধারায় সমাজের প্রচলিত কিছু নিয়ম, প্রথা মেনে চলতে শিক্ষা দেওয়া হয়। তিনি প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিকে ব্যাংকিং পদ্ধতি হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং মুক্তিকামী শিক্ষাধারা কার্যকর করতে সমস্যা-সমাধানমূলক পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন। তিনি মনে করেন, নিপীড়তজনের শিক্ষা এমন হওয়া উচিত, যেন তারা নীরবতার সংস্কৃতি ভাঙ্গতে পারে। তারা কেন নীরব থাকে, কেন কথা বলে না, কেমন অবস্থায় আছে, কেন আছে, কিভাবে শোষিত হচ্ছে ইত্যাদি উপলব্ধি করতে পারে। এ জন্য ফ্রেইরি একটি নতুন ধরনের শিক্ষা-পদ্ধতির কথা বলেছেন– সমস্যা-শনাক্তকরণ ও সমাধানমূলক পদ্ধতি। এ পদ্ধতিই হচ্ছে আমাদের 'সংলাপ' পরিচালনার মূলশক্তি।

ফ্রেইরি'র শিক্ষাদর্শনের মূল কথা হচ্ছে: ১. কোনো শিক্ষাই নিরপেক্ষ নয়– হয় তা আপোষকামী, নয় মুক্তিকামী; ২. শিখনবিষয় হতে হবে অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রাসঙ্গিক ও আগ্রহোদ্দীপক; ৩. শিক্ষা পদ্ধতি হতে হবে সমস্যাকেন্দ্রিক ও সমাধানমূলক; ৪. সংলাপ হবে শিখন প্রক্রিয়ার মূল প্রাণশক্তি; ৫. প্রাক্সিস অর্থাৎ 'সংলাপ? সমস্যা সমাধানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ? সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন? কর্মপ্রতিফলন? সংলাপ'– এ চক্রের রূপায়ণ এবং ৬. সমাজ রূপান্তর।

মুক্তিকামী শিক্ষার অন্যতম উপায় হচ্ছে প্রবলেম পোজিং মেথড (Problem Posing Method) বা সমস্যা-শনাক্তকরণ ও সমাধানমূলক পদ্ধতি। আর সমস্যা-শনাক্তকরণের প্রধান বাহক হচ্ছে 'কোড'। সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রাসঙ্গিক ও আগ্রহোদ্দীপক ইস্যুতে এ কোড তৈরি করতে হয়। 'কোড' মূলত সমস্যা শনাক্ত করা বা তার গভীর বিশ্লেষণের জন্য একটি সাংকেতিক বা ইঙ্গিতবাহী উপকরণ। সংলাপ-কে উদ্দীপ্ত করার জন্য এটি সূচনাসূত্র মাত্র। এটি হতে পারে ছবি, পোস্টার, ছোট

গল্প, মুকাভিনয়, নাটিকা বা রোল প্লে, রূপক খেলা (Simulation Game), গান, কবিতা, কেস স্টাডি, নকশা বা ডায়াগ্রাম, সিনেমা, গল্প বা প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি। এতে সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারীদের জীবনছোঁয়া চিত্রের প্রতিফলন থাকে। এনিমেটরের কাজ হচ্ছে, এরকম একটি কোড উপস্থাপন করে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সমস্যা ও তার কারণ শনাক্ত করতে সংলাপ-সদস্যদেরকে সহায়তা করা, অনুপ্রাণিত করা, সমস্যা-সমাধানের উপায় বের করতে প্রণোদিত করা।

পিআরএ (PRA) হচ্ছে, কিছু পদ্ধতি ও কৌশলের সমন্বয়ে পরিচালিত সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানের উপায় বের করার পন্থা বা প্রক্রিয়া যা স্থানীয় মানুষকে তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, সমস্যা-বিশ্লেষণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সে অনুয়ায়ী ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম করে। এটি হলো, আলাপ-আলোচনা ও পদক্ষেপ গ্রহণে 'স্থানীয় জনগণের হাতে ক্ষমতা ও দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার একটি কার্যকরী পন্থা'। এক্ষেত্রে একজন উন্নয়নকর্মীর ভূমিকা শুধু অনুঘটকের। যে ঘটনা ঘটাতে সহায়তা করে; কিন্তু প্রচ্ছন্ন থাকে। তাকে প্রধান্য বিস্তার করতে দেখা যায় না, যারা ঘটনার নায়ক তারা মনে করে তারাই ঘটনাটা ঘটিয়েছে; এর কৃতিত্ব তাদেরই। জনসাধারণের অবস্থার পরিবর্তন আনার জন্য তিনি সহায়ক হিসাবে ভূমিকা পালন করেন। অংশগ্রহণকারীগণ যাতে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারে তার জন্য PRAতে তাদেরকে দিয়ে মানচিত্র, ছক, নকশা প্রভৃতি আঁকানো ও বিশ্লেষণ করানো হয়। এগুলোই তাদেরকে আলোচনায় উদ্বুদ্ধ করে; কথা বলতে ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে সাহস যোগায়। মানুষের মাঝে হাজার বছরের বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার সুপ্ত আগুন। কোড ও পিআরএ টুলস-এর মাধ্যমে তা জাগিয়ে তোলাই হলো এনিমেটরের কাজ। আর এতেই সংলাপের সৃষ্টি হয়।

রিফ্লেক্ট– রিফ্লেক্ট হচ্ছে, ফ্রেইরি'র দর্শন ও পিআরএ'র মেলবন্ধনে সুসংগঠিত একটি প্রয়াস। এটি দলবদ্ধ নারীদের খোলামেলা আলাপ-আলোচনার প্রক্রিয়া; তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা বিশ্লেষণ ও তার সমাধান কেন্দ্র। এখানে দরিদ্র, হতদরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত নারীরা একজন এনিমেটরের সহায়তায় নিজেদের জীবন-জীবিকার নানা দিক নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক করেন। এর মাধ্যমে দৈনন্দিন সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধানে করণীয় কাজ নির্ধারণ করেন। পর্যায়ক্রমে সেসব কাজ বাস্তবায়ন করে সমস্যা-সমাধান করেন; অধিকার আদায় করেন; সমাজে ও পরিবারে নিজেদের মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেন। এক কথায়, তাঁরা এর মাধ্যমে ক্ষমতা ও সমতা অর্জন এবং জীবন-মান বৃদ্ধি করেন। জীবনের বিভিন্ন সমস্যার প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য এখানে সমন্বিত প্রক্রিয়ার উপর জোর দেয়া হয়। এ প্রক্রিয়া জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অধিকার-সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে তাঁদেরকে ধীরে ধীরে ক্ষমতায়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

এমএমএ– প্রশিক্ষণ-শিখনধারায় 'মাইন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্রোচ' (Mind Management Approach-MMA) এ দেশের মাটি থেকে অংকুরিত বাস্তব অনুশীলন-কেন্দ্রিক একটি উদ্ভাবনীমূলক দেশজ ধারা। বাংলাদেশের মাটিতে গত প্রায় ৪২ বছরের অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণ ও শিখনধারায় এটি একটি নতুনধারা, নতুন স্রোত। এই ধারায় প্রচলিত কাঠামোবদ্ধ অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করা হয়েছে; এবং এখনও হচ্ছে। এটি প্রচলিত অন্যান্য অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণধারার ভিতরের দ্বন্দ্বের বিকশিত রূপ; অভিজ্ঞতার সঞ্চিত ফল। ১৯৯৩ সালে বর্তমান নিবন্ধকার এএলআরডি'র প্রশিক্ষণে এই আপ্রোচের সূচনা ও বীজতলা তৈরি করেন। পরবর্তীকালে, ১৯৯৫ সালে অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের রিফ্লেক্ট প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে পরিকল্পিতভাবে এর ব্যাপকভিত্তিক ও নিবিড় প্রয়োগ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন এবং তারপর থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে সফল ও সার্থকভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে এই ধারা বিকশিত ও পরিপূর্ণতা লাভ করে। আন্তর্জাতিক কর্মশালায় এই অ্যাপ্রোচ ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক নিয়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি সমন্বয়ে দেশের মধ্যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া গত ৮ বছর ধরে এমএমএ প্র্যাকটিশনার্স সার্কেল নামে একটি ফোরাম এর বিকাশ, গবেষণা ও প্রসারে অবদান রাখছে।

এই অ্যাপ্রোচের মূল বিশ্বাস হচ্ছে, অংশগ্রহণকারীগণ নিজেরাই নিজেদের শিক্ষক বা শিখন সহায়ক এবং অংশগ্রহণকারীদের Mind-set বা 'শিখনমুখী মনই' কোনো প্রশিক্ষণে আত্ম-তাড়িত অংশগ্রহণের মূল চাবিকাঠি ও প্রধান প্রভাবক। আত্ম-তাড়িত অংশগ্রহণ ছাড়া সৃজনশীল শিখন সম্পন্ন হয় না। আর শিখন নিশ্চিত করা হচ্ছে যে কোনো প্রশিক্ষণের লক্ষ্য। মন নড়বড়ে হলে কিছুতেই কিছু হয় না; মনই সকল কিছুকে চালায়। খাদ্য, আবাসন, বিষয়, শিখন-চাহিদা, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি– সব কিছুর ওপর মনের প্রভাব সর্বব্যাপী ও সর্বাত্মক। তাই প্রশিক্ষকের প্রধান ভূমিকা হওয়া উচিৎ, প্রতিটি অংশগ্রহণকারীর মনকে শিখনের জন্য প্রস্তুত করে তোলা, তাদেরকে প্রশিক্ষণ-প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত বা স্ব-প্রণোদিত ও সম্পৃক্ত করে ফেলা; শিখন দান করা নয়। শিখন মাঝি বা প্রশিক্ষণ-সহায়কের অন্যতম ভূমিকা হচ্ছে, অংশগ্রহণকারীগণ যাতে স্ব-উদ্যোগে মনের গভীর থেকে তাড়িত হয়ে নিজের প্রয়োজনীয় শিখন অর্জনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত ও শিখন অর্জন করে এবং অন্যদেরকেও উদ্বুদ্ধ করে– সেই পরিবেশ রচনা করা। সে ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ-সহায়কের মূল কাজ হলো, সামগ্রিক প্রশিক্ষণ পরিবেশের মধ্যে একটি শিখন-আবহ ও শিখনজাল গড়ে তোলা, যাতে করে প্রতিটি অংশগ্রহণকারী সেই শিখন আবহ ও জাল থেকে নিজ নিজ বিষয় শিখে নিতে পারে। এই ধারায় সহায়ক বা শিখন মাঝি শুধু প্রশিক্ষণ পদ্ধতিকেই একমাত্র উপায় হিসেবে আঁকড়ে থাকেন না; শিখন উদ্দেশ্যকে

প্রধান টার্গেট ধরে অংশগ্রহণকারীদের মনের অবস্থার সাথে তাল রেখে সামনে এগিয়ে যান সন্তর্পণে। শিখন-উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য তিনি নানা রকম ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যান।

সংলাপ একটি নতুন ধারা হলেও একেবারে মৌলিক নয়। প্রচলিত ৪টি দর্শন ও অ্যাপ্রোচের সংমিশ্রণে এটি রূপায়িত। সেগুলো হলো: পাওলো ফ্রেইরির মুক্তকামী শিক্ষা দর্শন ও পদ্ধতি, পিআরএ, রিফেক্ট ও মাইন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্রোচ (এমএমএ)। এগুলোর সংমিশ্রণে সংলাপ উদ্ভাবিত হলেও সংলাপ এগুলো থেকে স্পষ্টতই আলাদা এক পন্থা। প্রক্রিয়া, সংলাপের ধরন ও ধারণা বিনিময় কৌশল– সব মিলিয়ে সংলাপ একটি নতুন অ্যাপ্রোচ বা প্যাকেজ; যা ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

৭. সংলাপ প্রক্রিয়া

সাধারণত যেকোনো সচেতনতামূলক কর্মপদ্ধতিতে কোনো একজন উপস্থাপক বক্তৃতা, আলোচনা, অথবা ফ্লিপচার্ট প্রদর্শন করে ব্যাখ্যা করে থকেন। এতে যে একেবারে কাজ হয় না, তা নয়। তবে তাতে শিখন তেমন স্থায়িত্ব পায় না বা প্রত্যেকের অংশগ্রহণ ও আত্মস্থকরণ নিশ্চিত হয় না। কারণ এক্ষেত্রে উপস্থাপকের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বেশি থাকে। প্রত্যেকের সক্রিয় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সাম্য থাকে না। দু'-চারজন বেশি মাত্রায় কথা বলে থাকেন এবং অন্যরা তার সাথে সুর মেলান মাত্র। ফ্রেইরি'র শিক্ষা-পদ্ধতি সমস্যা-সমাধানমূলক বা সমস্যা-বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি নামে পরিচিত। (Problem-posing method), পিআরএ ও রিফ্লেক্ট অ্যাপ্রোচে এই সমস্যা অনেকাংশে দূরীভূত হয়। ফ্রেইরি ও পিআরএ'র সংমিশ্রণে রূপায়িত রিফ্লেক্ট-প্রক্রিয়ায় সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তার কারণ বিশ্লেষণে প্রয়াস নেয়া হয় এবং তা কিছুটা সফলও হয়। তবে নিবন্ধকার তাঁর অভিজ্ঞতায় পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, প্রক্রিয়াগত অস্পষ্টতা ও সীমাবদ্ধতার জন্য অংশগ্রহণকারীগণ সাধারণত আলোচ্য ইস্যু বা সমস্যার কারণ এবং 'কারণের কারণ' বিশ্লেষণ ও আত্মস্থকরণে তেমন সফল হয় না।

মূল সংলাপ-কাঠামো ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এটি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি বিশ্লেষণমুখী; যা অন্যান্য প্রক্রিয়া থেকে স্পষ্টতই ভিন্ন মাত্রার। এবং এই প্রক্রিয়ায় আলোচ্য ইস্যু জনজীবনে কী ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে, তার কারণ এবং কারণগুলো কীভাবে পরিবার ও সমাজজীবনে বহাল তবিয়তে টিকে আছে, তা অর্থাৎ root causes চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করার হাতিয়ার হিসেবে অনেক বেশি শাণিত ও ঋদ্ধ।

এই পটভূমিতে 'সংলাপ' প্রক্রিয়া রূপায়িত হয়েছে।

পাঠকের উপলব্ধি করার সুবিধার্থে নিচে 'সংলাপ' প্রক্রিয়া এবং তার প্রতিটি ধাপে করণীয় তুলে ধরা হলো:

সংলাপ পরিচালনার ধাপ

১. বিষয় বা সমস্যাভিত্তিক কোড/নকশা/ছবি উপস্থাপন
২. সমস্যার ফলে ক্ষতিসমূহ চিহ্নিত করা
৩. এলাকার **বাস্তব ঘটনা** উল্লেখ করে তা মিলিয়ে নেয়া
৪. সমস্যার **কারণ চিহ্নিতকরণ**
৫. **কারণগুলো** কেন টিকে আছে তা বিশ্লেষণ
৬. **কারণগুলো** দূর করার উপায়
৭. **আত্ম-প্রতিজ্ঞা**/সংকল্প/শপথ গ্রহণ
৮. বিষয় ভিত্তিক তথ্য বিনিময়
৯. পুনরালোচনা/পর্যালোচনা ও ফলোআপ

৮. সংলাপ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা

উপরে প্রদত্ত সংলাপ-কাঠামো অনুসারে একজন এনিমেটর বা সংলাপ-সঞ্চালক 'সংলাপ' পরিচালনায় সহায়তা করে থাকেন। কিশোরীরা তাঁর সহায়তায় এ কাঠামো অনুসরণ করে ধাপে ধাপে কোনো ইস্যু বা প্রভাবক সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে থাকে।

ধাপ-১: বিষয় বা সমস্যাভিত্তিক কোড উপস্থাপন– এ ধাপে এনিমেটর যে ইস্যু বা প্রধান সমস্যা নিয়ে আলাপ পরিচালনা করবেন তার একটি কোড বা সাংকেতিক ছবি উপস্থাপন করবেন। কোড হচ্ছে, কোনো সমস্যার গভীর বিশ্লেষণের সুবিধার্থে আঁকা ইঙ্গিতবহ ছবি। এ ছবি দেখে অংশগ্রহণকারীগণ সমস্যাটির নানাদিক ব্যাখ্যা করে থাকেন। কোড উপস্থাপনের পর কিশোরীরা এ ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে তা বর্ণনা করে থাকে। ছবির ভেতরে লুকানো ছবি উদঘাটন করে থাকে।

ধাপ-২: সমস্যার ফলে ক্ষতিসমূহ চিহ্নিত করা– এ ধাপে কিশোরীরা আলোচ্য সমস্যার ফলে কিশোরী, তাদের পরিবার ও সমাজ কী কী ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে, তা চিহ্নিত করে। এনিমেটরের সহায়তায় কিশোরীরা তা বোর্ডে বা পোস্টারে লেখে বা পিআরএ'র একটি টুল (যেমন: সমস্যা স্কোরিং, প্রবাহ চিত্র) ব্যবহার করে তাতে প্রতিফলিত করতে থাকে।

ধাপ-৩: এলাকার বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করে তা মিলিয়ে নেয়া– এ ধাপে কিশোরীরা তাদের নিজের জীবনের, পরিবারের বা সমাজে দেখা বাস্তব ঘটনাগুলো বর্ণনা করে থাকে। যে সমস্যা নিয়ে সংলাপ চলছে ওই সমস্যা তাদের বাস্তব জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে, তারা বাস্তবে কী কী ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, তা জীবন থেকে নিয়ে অন্যদের সামনে তুলে ধরে; বাস্তবে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা অভিনয় করেও দেখিয়ে থাকে। এত করে ইস্যু সম্পর্কে তাদের ধারণা আরও স্পষ্ট আরও জীবন্ত হয়ে ধরা দেয়। এ পর্যায়ে কেউ কেউ আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে। সমাজ-সংসারে মুখোমুখি হওয়া তাদের অন্তর্জ্বালা প্রকাশ করে থাকে। এ সমস্যা থেকে যে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার, সেই বোধটি তাদের মধ্যে আরও জোরালো হয়। সমস্যা সমাধানের জন্য তারা উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

ধাপ-৪: সমস্যার কারণ চিহ্নিতকরণ– এ ধাপে কিশোরীরা যে সমস্যা বা ইস্যু নিয়ে সংলাপ হচ্ছে, তার কারণ চিহ্নিত করে থাকে। এ পর্যায়ে আপাতদৃষ্টিতে যেসব সমস্যা ধরা পড়ে বা সহজেই যেসব কারণ বোঝা যায়, সেগুলো মুক্ত আলোচনায় বা

মুক্ত চিন্তার ঝড় বা মানিকজোড়ে আলোচনায় তুলে ধরে। এনিমেটর সেসব বোর্ডে বা কাগজে লেখেন। উদাহারণস্বরূপ, অভিভাবকেরা বাল্যবিবাহ কি কি কারণে দিয়ে থাকে সেগুলো কিশোরীরা বর্ণনা ও পর্যালোচনা করে থাকে। কারণ হতে পারে, সমাজে নিরাপত্তার অভাব, পড়ালেখা না করা, বাল্যবিবাহের ক্ষতি ও প্রভাব সম্পর্কে অভিভাবকদের মধ্যে বিশ্লেষণমূলক স্তরের সচেতনতা না থাকা, মেয়েকে লালন পালন করার আর্থিক সক্ষমতার অভাব, বয়স বেড়ে গেলে উপযুক্ত বর না পাওয়ার আশঙ্কা ইত্যাদি। এ কারণগুলো কাগজে লেখা হয়। কারণ চিহ্নিত করার জন্য কখনো কখনো পিআরএ টুলসও ব্যবহার করা হয়।

ধাপ-৫: কারণগুলো কেন টিকে আছে তা বিশ্লেষণ– এ ধাপের আলাপ একটু জটিল হলেও তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ পর্যায়ে সমস্যার কারণগুলো সমাজে কেন টিকে আছে, ক্ষতিকর হওয়া সত্ত্বেও কেন তা সমাজ থেকে দূর করা যাচ্ছে না, তা চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করা হয়। উপরের ধাপে চিহ্নিত কারণগুলোর প্রতিটি কারণের গভীরে প্রবেশ করে কারণের পেছনের কারণ বিশ্লেষণ করা হয়। কখনো কখনো উপরে চিহ্নিত প্রতিটি কারণের পেছনের কয়েকটি কারণ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়।

প্রোথিত বৃক্ষের মতো সমাজে বদ্ধমূল কিছু সংস্কার, নেতিবাচক মূল্যবোধ, প্রথা, শোষণ, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার মূল অপকৌশল চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করা হয়। মূলত এগুলোই প্রায় সমস্ত সমস্যায় মূল কারণ বা root causes। এবং এগুলো উপড়ে ফেলতে পারলেই আপাত দৃশ্যমান সমস্যা ও তার কারণ দূর করা সম্ভব।

যেমন, বাল্যবিবাহের যেসব কারণ উপরের ধাপে চিহ্নিত করা হয়েছে, তার পেছনের কারণ মূলত অজ্ঞতা, কুসংস্কার। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা প্রথা শোষণ-বঞ্চনা-প্রবঞ্চনা থেকে উৎসারিত দারিদ্র্য ইত্যাদি। কারণের কারণ চিহ্নিত করার জন্য কখনো কখনো পিআরএ টুলসও ব্যবহার করা হয়। যেমন: সমস্যাবৃক্ষ।

ধাপ-৬: কারণগুলো দূর করার উপায় বের করা– এ পর্যায়ে যেসব কারণে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে, তা কীভাবে সমাজ ও পরিবার থেকে দূর করা যায় তা আলোচিত হয়। চিহ্নিত উপায়গুলো কাগজে লেখা হয়। কখনো কখনো ছোট দলে ভাগ হয়ে উপায় চিহ্নিত করা হয়; কখনো কখনো মুক্ত আলোচনায় তা চিহ্নিত করা হয়। যেমন বাল্যবিবাহের যেসব কারণ চিহ্নিত হয়েছে তা দূর করার কৌশল হিসেবে যেগুলো নির্দিষ্ট করা হয় সেগুলো হচ্ছে:

১. সমাজে মেয়েদের নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য তরুণ ও কিশোরী ব্রিগেড তৈরি;

২. মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠাতে অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করা;

৩. বাল্যবিবাহের ফলে কিশোরী ও পরিবারে কী কী প্রভাব বা ক্ষতি হতে পারে সে সম্পর্কে নাটক তৈরি করে তা পাড়ায় পাড়ায় উপস্থাপন বা সচেতন অভিভাবকদের মাধ্যমে অন্য অভিভাবকদেরকে বোঝানো ইত্যাদি।

ধাপ-৭: আত্ম-/প্রতিজ্ঞা বা সংকল্প গ্রহণ– এ পর্যায়ে ওপরে চিহ্নিত উপায়গুলোর মধ্যে কিশোরীরা নিজেরা কী কী করবে তা মুক্ত আলোচনা বা ছোট দলে কাজ করে চিহ্নিত ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। এবং সেগুলো পালনে বা বাস্তবায়নে আত্ম-প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হয়। অবশ্য কিছু কিছু কাজ তারা অন্যদের মাধ্যমে করিয়ে থাকে।

ধাপ-৮: ইস্যুভিত্তিক তথ্য বিনিময়– এ ধাপে যে সমস্যা নিয়ে আলাপ হয়েছে, সেসব সমস্যার পদ্ধতি ও সমাধানের উপায় হিসেবে কিছু সুনির্দিষ্ট ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য বিনিময় করা হয়। এ ক্ষেত্রে কারিগরি, বৈজ্ঞানিক ও পরিষেবা-সংক্রান্ত তথ্য দেয়া হয়। তবে এসব তথ্য এনিমেটর ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ধাপেও দিয়ে থাকেন। অনেক সময় এ সব তথ্য পাওয়ার পরও কিশোরীরা আত্ম-প্রতিজ্ঞা চিহ্নিত করে থাকে।

ধাপ-৯: পুনরালোচনা ও ফলোআপ– এ ধাপে এনিমেটর ও কিশোরীরা যৌথভাবে গত ৮/১০ দিনের শিখন পুনরালোচনা করে থাকে। তারা কতটুকু আত্মস্থ করেছে তা যাচাই ও ঝালাই করে থাকে। এ জন্য তারা নানাবিধ কৌশল নিয়ে থাকে। এটি মূলত স্ব-মূল্যায়ন পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকে। এ পর্যায়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে আত্ম-প্রতিজ্ঞা ও করণীয়গুলো কতটুকু বাস্তবে পালন করা হয়েছে তা মূল্যায়ন ও মনিটর করা হয়ে থাকে।

মোট ৮ থেকে ১০ দিন সময়ে একটি ইস্যুভিত্তিক সংলাপ সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

৯. সংলাপের বিস্তার:

স্ট্রম ফাইন্ডেশন নরওয়েভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক অনুদান ও পার্টনারভিত্তিক সংস্থা। এর আঞ্চলিক অফিসগুলো পূর্ব আফ্রিকা, পশ্চিম আফ্রিকা, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত। ২০০৬ সালে 'সংলাপ' ডিজাইন ও বাস্তবায়নের পর নরওয়ে ও অন্যান্য আঞ্চলিক অফিসে এর প্রভাব পড়ে। নরওয়ে ও আঞ্চলিক অফিসগুলো থেকে বিভিন্ন টিম কৌতূহলী হয়ে বাংলাদেশে রূপায়িত এই নতুন প্রয়াস সরেজমিনে দেখতে আসে এবং দেখে অনুপ্রাণিত হয়। পরবর্তী কালে বাংলাদেশ থেকে ১৭ জন কিশোরী নরওয়েতে আমন্ত্রিত হয়ে সেখানকার শিক্ষার্থী, কিশোরী, সরকারি-বেসরকারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও মন্ত্রীদের সামনে সংলাপ ও তার প্রভাব বিষয়ে উপস্থাপনা করে। এতে করে এসএফ-এর অন্যান্য অঞ্চলের কর্ম-এলাকার নীতিনির্ধারকদের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া পড়ে। নরওয় সরকার ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশে আরো ৫ বছরের সংলাপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বড় ধরনের অনুদান দেয়। পরবর্তী কালে অন্যান্য দেশে 'সংলাপ' অভিযোজিত ও বাস্তবায়িত হয়।

বাংলাদেশ: বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কয়েক পর্যায়ে ৩০০০-এর বেশি সংলাপ কেন্দ্র পরিচালিত হয়েছে। এর মাধ্যমে ৮৭,০০০-এর বেশি কিশোরী সংলাপ প্রক্রিয়ায় জীবন-সচেতন ও জীবন-দক্ষতা

অর্জন করেছে। এ ছাড়াও সংলাপ-এর প্রভাবে প্রায় ১৫০টি কেন্দ্র থেকে ৩০০০-এর বেশি কিশোর প্রত্যয় কেন্দ্রে অংশ নিয়েছে। এছাড়া ইন্টার‍্যাকশানের কারিগরি সহায়তার আশ্রয় নিজস্ব উদ্যোগে রাজশাহীতে আদিবাসী কিশোরীদের সাথে 'গালমারাও ঠাই' নামে 'সংলাপ' অভিযোজিত ও বাস্তবায়িত করেছে।

পূর্ব আফ্রিকা: পূর্ব আফ্রিকায় ২০১১ সালে সংলাপ অভিযোজিত ও বাস্তবায়িত হয়। স্ট্রম ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে নির্বাচিত হয়ে সেখানে সংলাপ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ও কার্যক্রম বাস্তবায়িত করতে কারিগরি সহায়তা ও হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়ার জন্য ইন্টার‍্যাকশনের প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী জায়েদ আল হাসান জয় ১৫ মাস অবস্থান করেন। তিনি অত্যন্ত সফলভাবে পূর্ব আফ্রিকার উগান্ডায় সংলাপ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন। পরবর্তীকালে আরো দু'জন বাংলাদেশী প্রশিক্ষক সেখানে গিয়ে সহায়তা দেন। এ পর্যন্ত ১৮ জন প্রশিক্ষক ও ১০৮ জন এনিমেটর সংলাপ ও এমএমএ বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। মোট ১০৮টি কেন্দ্রে ২৭০০ কিশোরী সংলাপে অংশ নেয়। পূর্ব আফ্রিকার টিভি চ্যানেল এনটিভিতে সংলাপ ও এমএমএ বিষয়ে একটি উপস্থাপনা পরিবেশন করা হয় এবং এতে সাক্ষাৎকার দেন জায়েদ আল হাসান।

নেপাল: ২০১০ সালে সংলাপ-এর অভিজ্ঞতা নেয়ার জন্য নেপাল থেকে একটি বিশেষ দল বাংলাদেশে আসে। ব্রিফিং ও মাঠ-অভিজ্ঞতা নেয়ার পর স্ট্রম ফাউন্ডেশন-নেপাল ৪টি পার্টনারের মাধ্যমে 'সম্ভাদ' নামে সংলাপ বাস্তবায়ন করে। তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেন বালাদেশে সংলাপ-এর প্রথম প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রথম ব্যাচে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোডেকের সাফিউল্লা মজুমদার। পরবর্তী কালে বাংলাদেশ থেকে একটি টিম নেপালে সংলাপ কার্যক্রম রিভিউ করে। প্রথম পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়নে কিছুটা বিভ্রান্তি দেখা দেওয়ায় এবং তা তেমন কার্যকর না-হওয়ায় সম্প্রতি ১২-১৮ ডিসেম্বর, ২০১৩-তে সিরাজুদ দাহার খান ও আফ্রিকায় অভিজ্ঞাতালব্ধ জায়েদ আল হাসান জয় নেপালে নতুন করে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ দেন। মাইন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্রোচে পরিচালিত এ প্রশিক্ষণ গভীরভাবে তাদেরকে আলোড়িত করে। এ প্রশিক্ষণে স্ট্রম ফাউন্ডেশন নেপালের প্রধান সমন্বয়ক থেকে শুরু করে তৃণমূলের প্রশিক্ষক ও সুপারভাইজারগণ অংশ নেন এবং সংলাপ ও এমএমএর মূল ধারণা ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস ও স্পষ্ট ধারণা লাভ করেন। পরবর্তীকালে এনিমেটরদের প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করে মাঠ পর্যায়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে কার্যক্রম শুরু করেছেন।

নেপালে এ পর্যন্ত মোট ৪৪৬টি কেন্দ্র পরিচালিত হয়েছে, এবং ৫১৮ জন এনিমেটর প্রশিক্ষিত হয়েছেন। মোট ৬১ জন প্রশিক্ষক তৈরি হয়েছেন। এ পর্যন্ত ১৭১০ জন কিশোরী অংশগ্রহণ করেছে। বর্তমানে ৭২টি কেন্দ্র চালুর পথে প্রস্তুতি চলছে, যার মাধ্যমে ২০১৪ সালের মধ্যে ১৪৪০ জন কিশোরী জীবন-সচেতনতা ও জীবন দক্ষতা অর্জন করবে।

মিয়ানমারেও সংলাপ অভিযোজনের চিন্তাভাবনা চলছে। এ ছাড়া আমেরিকায় একটি ওয়েব পোর্টাল আছে, যেখান থেকে সংলাপ-এর ধারণা ও বিভিন্ন সফলতার ঘটনা নিয়মিত প্রচার করা হয়। আশা করা হচ্ছে, সামনের দিনগুলোতে সংলাপ অন্যান্য দেশেও দ্রুত সঞ্চারিত হবে।

১০. মূল্যায়ন ও প্রভাব

প্রতিটি সংলাপ বাস্তবায়ন সংস্থা নিজের মতো করে সংলাপ কার্যক্রম মূল্যায়ন করে থাকে। দেশ-বিদেশের নানা অংশীজন নিয়মিত সংলাপ পরিদর্শন ও এর প্রভাব মূল্যায়ন করে থাকেন। এ ছাড়াও এসএফ বাংলাদেশ সংলাপের পেশাদার পরামর্শক ও গবেষক দিয়ে দু'বার মূল্যায়ন করেছে। তাদের কাছ থেকে দিক-নির্দেশনা পাওয়া গেছে এবং সেসবের উপর ভিত্তি করে সংলাপ গাইড বই ও বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনায় পরিমার্জন ও অধিকতর উন্নয়ন করা হয়েছে। যাহোক, সবার মূল্যায়ন থেকে সংলাপের প্রভাব হিসেবে নিম্নোক্ত দিকগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

সংলাপ-এর অর্জন– সংলাপ কার্যক্রমের প্রভাব বা কিশোরীদের অর্জন সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. বয়ঃসন্ধিকালীন সমস্যা সমাধানে মতবিনিময় করে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে;
২. ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মেনে চলছে;
৩.স্থানীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেবা গ্রহণের জন্য যাচ্ছে;
৪. জীবনধর্মী বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা লাভ করেছে;
৫. কিশোরীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছে;
৬. কিশোরীরা নিজস্ব মতামত প্রকাশের দক্ষতা লাভ করেছে;
৭. গ্রামবাসীদের/সমবয়সীদের সচেতন করতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে;
৮. আত্মবিশ্বাস-এর সাথে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে;
৯. আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার দক্ষতা অর্জন করেছে;
১০.নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্যা নিজেরাই সমাধানের চেষ্টা করেছে;
১১. পরিবারে তাদের মতামতের গুরুত্ব পাচ্ছে;
১২. আত্মসম্মানবোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে;
১৩. সমস্যা সমাধানের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছে;
১৪.সেবাদান প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করে সেবা আদায় করতে পারছে;
১৫. সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে;
১৬. বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ রোধ করছে;
১৭. নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছে;
১৮. কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতা অর্জন করছে;
১৯. জীবন দক্ষতা অর্জন করছে;
২০. আইজিএ-র মাধ্যমে নিজেকে প্রশিক্ষিত করে স্বাবলম্বী হওয়ার দিকে এগোচ্ছে।

সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ–পৃথিবীতে এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত সকল অ্যাপ্রোচ বা প্যাকেজের সীমাবদ্ধতা ধরা পড়েছে। সংলাপেরও কিছু সীমাবদ্ধতা বা চ্যালেঞ্জ আছে, যা যথাযথ পদক্ষেপ দ্বারা দূর

করা সম্ভব। সেরকম কিছু সীমাবদ্ধতা নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. **নিবেদিতপ্রাণ ও যোগ্যতাসম্পন্ন এনিমেটর পাওয়া–** অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, নিবেদিতপ্রাণ ও যোগ্যতাসম্পন্ন এনিমেটরের অভাবে সকল এনিমেটরকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় দক্ষ ও প্রণোদিত করা যায় না। কারণ, অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় কর্তৃত্ব কম থাকায় বেশ নমনীয় এবং অপেক্ষাকৃত সময়সাপেক্ষ হওয়ায় তারা কেউ কেউ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না।

২. **সামাজিক প্রতিবন্ধকতা–** সংলাপে বেশ কিছু বিষয় আলোচিত হয়, যা প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সাথে যায় না। যেমন, প্রজনন স্বাস্থ্য, বয়ঃসন্ধিকালীন জটিলতা, যৌন নিপীড়ন, ঋতুস্রাব, যৌনরোগ ইত্যাদি। ফলে প্রথম দিকে পারিবারিক ও সামাজিক অনীহা কিশোরীদেরকে সমবেশিত ও ধরে রাখা চ্যালেঞ্জ হয়। অবশ্য ধীরে ধীরে এ সমস্যা দূর হয়ে যায়।

৩. **সংলাপ ধাপ পরিচালনা–** সংলাপ-এর দু'একটা ধাপ বিশেষ করে বিভিন্ন কারণ কেন সমাজে টিকে আছে এবং বাস্তবভিত্তিক করণীয় নির্ধারণ– এসব ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে এনিমেটর ও কিশোরী দু'পক্ষই কিছুটা গুলিয়ে ফেলে। শাণিত প্রশিক্ষণ এবং হাতে কলমে ধারাবাহিক অনুশীলনের মাধ্যমে এ সমস্যা অনেকটা কাটিয়ে ওঠা যায়।

৪. **অন্য ২/১টি প্রয়াসের সাথে গুলিয়ে ফেলা–** অনেক সময় অনেক এনিমেটর ও ভিজিটর সংলাপ প্রক্রিয়াকে রিফেক্ট, পিআরএ এবং অন্যান্য প্রয়াসের সাথে গুলিয়ে ফেলেন। মূলত, সংলাপ ফ্রেইরির দর্শন, পিআরএ, এমএমএ ও রিফেক্টের সংমিশ্রণে উদ্ভাবিত ও রূপায়িত হলেও এটি একটি স্বতন্ত্র প্রয়াস– এককভাবে ওপরের কোনটিই নয়।

৫. **IGA-তে বেশি মনোযোগ–** অনেক সময় কিশোরী, অভিভাবক, সুপারভাইজার এমনকি বাস্তবায়ন সংস্থার ব্যবস্থাপকদের মধ্যেও সংলাপ কর্মসূচির শেষের ৩ মাসে যে IGA প্রশিক্ষণ ও প্রাথমিক অর্থ সহায়তা দেয়া হয়– সেটির ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন; তার দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়ে থাকেন। ফলে সংলাপের যে মূল স্পিরিট– কিশোরীদের জীবন-সচেতনতা অর্জন এবং এ বয়সের সমস্যা ও তা মোকাবেলা করা এবং সামাজিক অবদানের বিষয়টি কম গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এতে সংলাপের মূল লক্ষ্য ব্যাহত হতে বা মার খেতে পারে।

৬. **মালিকানাবোধের অভাব–** সংলাপকেন্দ্র শুরু করার পূর্বে অভিভাবক ও এলাকাবাসীর মধ্যে এর নিজস্বতাবোধ বা ওনারশিপ সৃষ্টি করতে না পারলে সংলাপের দীর্ঘসূত্রিতা ও বস্তুকেন্দ্রিক চাহিদা সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য কর্মসূচি শুরু করার পূর্বেই 'কমিউনিটি ইনভলভমেন্টের' জন্য অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় কমিউনিটিতে দিন সাতেক সময় বিনিয়োগ করা উচিত।

১২. ভবিষ্যৎ পথরেখা

গত ৭ বছরে সংলাপ একইভাবে চলতে চলতে এতে কিছুটা গতিশীলতার অভাব দেখা দিতে পারে। এ জন্য এর কর্মপরিধি ও মাত্রা সম্প্রসারিত করতে হবে। যেমন ১২ মাসের কর্মসূচি শেষ হওয়ার পরে আর কী কী নতুন ইন্টারভেনশন যুক্ত করা যেতে পারে, তা ভাবতে হবে। যেমন:

১. কিশোরী ক্লাব গঠন– এখানে নতুন পুরানোর আলাপ কেন্দ্র গড়ে তোলা।

২. কিশোরীদের মাধ্যমে জনসমাজকে সম্পৃক্ত করে তাদের অধিকার প্রাপ্তিতে আরও পরিকল্পিত ক্যাম্পেইন ও অ্যাডভোকেসি করা।

৩. আওতাভুক্ত কিশোরীরা অন্য কিশোরীদের মধ্যে কীভাবে তাদের লব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা পদ্ধতিগত ও অনানুষ্ঠানিকভাবে ছড়িয়ে দিতে পারে তার পন্থা উদ্ভাবন ও সংযোজন করা।

৪. উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত কিশোরীদের জীবন-সমস্যা সমাধানে কী কী পরিষেবা আছে তা চিহ্নিত এবং তা প্রাপ্তির কৌশল নির্ধারণ করা।

৫. কিশোরীদের অধিকার নিশ্চিত করতে জাতীয় পর্যায়ে নতুন নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি করা।

১৩. প্রত্যয়

সংলাপের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় কিশোরদের মধ্যে এর ব্যাপক চাহিদা দেখা দেয়। সে চাহিদায় সাড়া দিয়ে স্ট্রম ফাউন্ডেশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে ইন্টার‍্যাকশন ও বর্তমান নিবন্ধকার কারিগরি সহায়তা দেয় এবং 'প্রত্যয়' নামে কিশোর-ক্ষমতায়নের জন্য আরো একটি কর্মসূচি রূপায়ণ করে। স্ট্রম ফাউন্ডেশন-এর কয়েকটি পার্টনারের মাধ্যমে তা দেশের কয়েকটি অঞ্চলে পরীক্ষণমূলকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এক্ষেত্রেও সংলাপ-প্রক্রিয়া অনুসরণ করলেও আলোচ্য বিষয়, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা ব্যবস্থার কিছুটা রদবদল করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ১৫০ কেন্দ্রে ৩০০০-এর বেশি কিশোর প্রত্যয়-এ অংশ নিয়েছে।

১৪. উপসংহার

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভবের আগে ও পরে এ দেশে বেশ কিছু উদ্ভাবনমূলক অ্যাপ্রোচ রূপায়িত হয়েছে। দেশের বাইরে থেকেও অনেক ধরনের ধারণা ও প্যাকেজ আমদানি করা হয়েছে। এসবের কিছু বাতিল হয়ে গেছে, আবার কতগুলো বেশ কিছুটা সংস্কৃত হয়ে কমবেশি সফলতার সাথে টিকে আছে। সংলাপ-ও তেমন একই উদ্ভাবনীমূলক প্রয়াস। গত ৭ বছরে প্রেরণাসঞ্চারী প্রয়াস হিসেবে দেশে ও দেশের বাইরে তা উন্নয়ন সংগঠন ও তার কর্মীদের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে; এবং জনগ্রাহ্যতা লাভ করেছে। কিশোরীদের দিয়েছে পথ চলার আলো। নিরন্তর সংযোজন- বিয়োজন-পরিমার্জনের মাধ্যমে সময়ের চাহিদার সাথে সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারলে সংলাপও দীর্ঘমেয়াদী কোনো একটা পন্থা হিসেবে টিকে যাবে বলে আশা করা যায়। তা না-হলে এটাও এক সময় ঝিমিয়ে পড়তে পারে। ভবিষ্যতে সময়ের নতুন চাহিদা ও যুগের মাতাল হাওয়ায় এটাও মিলিয়ে যেতে পারে। তাই প্রতিনিয়ত সংলাপ অভিযোজিত ও বিকশিত হোক এই প্রত্যাশা সংশ্লিষ্ট সবার।

সিরাজুদ দাহার খান
নির্বাহী পরিচালক, ইনটার‍্যাকশন

সাকিলা মতিন মৃদুলা

নারীশিক্ষার কক্ষপথে

স্বপ্ন, আশা আর আকাঙ্ক্ষিত আলোর প্রতীক সূর্য। রাত শেষে নতুন একটি দিন শুরু হয় সূর্যের আলোর উদ্ভাসনে। আকাঙ্ক্ষিত সূর্য কিন্তু স্থির। সূর্যকে ঘিরে পৃথিবী ঘূর্ণায়মান। পৃথিবীর মাঝে আমরা, মানুষেরা। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে তার নিজস্ব কক্ষপথে। ঘূর্ণায়মান সময়ের আবর্তে কখনও পৃথিবীর এক প্রান্তে সূর্যের আলো পড়ে আবার কখনও অন্ধকার। আলো আঁধারের এই লুকোচুরি কখনও খুব বেশী আলোক-উজ্জ্বল আবার কখনওবা গহীন অন্ধকার। নারীশিক্ষার অগ্রগতি পৃথিবীর কক্ষপথের মতোই। 'শিক্ষা' যেন ঠিক সূর্যের মতোই স্থির। শিক্ষাকে ঘিরে ঘুরছে সময়। আর সময়ের সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে শিক্ষার চাহিদা, পরিকল্পনা ও কার্যকারণ। সময়ের বেড়াজালে কখনও বাড়ছে নারীশিক্ষার হার, আবার কখনও তা হ্রাস পাচ্ছে। আজকের সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যতটুকু এগুনো গতকালের হিসেবে হয়তোবা সেটুকু কিছুই নয়। একই বেড়াজালের বৃত্তেই তার বসবাস। সত্যিই কি তাই? আমরা কি নারীশিক্ষার অগ্রগতিতে একই বৃত্তেই ঘুরপাক খাচ্ছি?

১৮৫০ ও ৬০- এর দশকে মেয়েদের শিক্ষার বিষয় নিয়ে সমাজ দ্বিধাবিভক্ত ছিল। কেশবচন্দ্র সেন, উমেশচন্দ্র দত্ত সহ আরও অনেকে ছিলেন মেয়েদের 'মেয়েলি' বিষয় যেমন সেলাই, রান্না, সন্তান পালন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেয়ার পক্ষে। অন্যদিকে শিবনাথ নাস্ত্রী, দূর্গামোহন দাস, শশীপদ ব্যানার্জী প্রমুখ মনে করতেন শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের কোন ভেদাভেদ থাকা উচিৎ নয়। সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়েছে বৈকি! শিক্ষার বিষয়বস্তুতে এখন আর নারী-পুরুষ ভেদাভেদ নেই। নারীদেরও অনুপ্রেরণা দেয়া হচ্ছে দক্ষতা উন্নয়নমূলক শিক্ষা বিষয়ে। কিন্তু নারীশিক্ষা বিষয়ে দ্বিধাবিভক্তি এখনও বিরাজমান ঠিক আগের মতোই। একবিংশ শতাব্দীতে দ্বিধাবিভক্তির পরিধি বেড়েছে। এখন সমাজ দ্বিধাবিভক্ত পাঠ্যপুস্তকের জেন্ডার সংবেদনশীলতা নিয়ে। এই দ্বিধাবিভক্তি কমছে না কেন?

কেশবচন্দ্র সেন ও বিজয় দত্ত প্রধানের মতো প্রগতিশীল চিন্তাধারার মানুষেরাও স্ববিরোধিতায় ভুগতেন নারী শিক্ষার অগ্রগতি নিয়ে। তারা নিজেরা নারীশিক্ষার পক্ষে কথা বললেও নিজেদের স্ত্রী এবং মেয়েদের স্কুলে পাঠাতেন না। নারীশিক্ষা নিয়ে শিক্ষিত সচেতন জনগোষ্ঠীর এহেন স্ববিরোধী আচরণ এখনও বর্তমান। যেসব সামাজিক প্রতিবন্ধকতাগুলো নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে বাধা হয়ে দাঁড়াতো তার বেশীর ভাগই আজও বিদ্যমান। সেই সময়ের মত আজও বাল্যবিবাহ এবং পর্দাপ্রথা নারীর শিক্ষা বিস্তারে বাধা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বিদ্যালয়ে ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু ঝরে পড়ার সংখ্যা কমছে না। শুরু হচ্ছে সুন্দর কিন্তু গঠনমূলকভাবে শেষ হচ্ছে না। কিন্ত কেন কিংবা আর কতদিন?

বাংলায় নারীশিক্ষার প্রথম অধ্যায় শুরু হয় ১৮১৮ সালে। রবার্ট মে কলকাতার কাছে চুঁচূড়ায় প্রতিষ্ঠা করেন বালিকা বিদ্যালয়। পরবর্তী কালে চার্চ মিশনারি সোসাইটির সহায়তায় মিস এ্যান কুক ১৮২৩ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে কলকাতা এবং কলকাতার আশেপাশে প্রায় ৩০টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। যদিও নারীশিক্ষার অগ্রগতির প্রথম এই ধাপ পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিল। উচ্চবিত্ত অভিজাত শ্রেণী নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেও রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে সাহস দেখায়নি। মিশনারি স্কুলগুলোতে ধর্মান্তরের প্রচলিত ধারণার কারণেও নারীশিক্ষার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য, সমাজের প্রথা ভাঙতে অভিজাত শ্রেণী সাহস না দেখালেও সেই সময়ে নিচু বর্ণের হিন্দু মেয়েরা স্কুলগুলোতে পড়তে যেত। ১৮১৫ সাল থেকে ১৮২৬ সালের মাঝে ঢাকায় প্রতিষ্টিত মিশনারি স্কুলগুলোও একইভাবে ব্যর্থ হয়।

নারীশিক্ষার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরু হয় ১৮৪০ এর শেষের দিকে। ১৮৪৯ সালের মে মাসে কলকাতায় ভিক্টোরিয়া গার্লস স্কুল (বেথুন স্কুল নামে সমধিক পরিচিত) ১১ জন ছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করেই তা কমে যায় ক্রমান্বয়ে ৭ থেকে ৩ এ। ঝরে পড়ার প্রবণতা ঠেকাতে এই একবিংশ শতাব্দীতেও চলছে নানারকম চেষ্টা। নারীশিক্ষা বিস্তারে বেথুন স্কুলের অবদান ছিল অসামান্য। ঢাকা শহরে মেয়েদের জন্য সরকারী স্কুল ১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৮৭২ সালে তা বন্ধ হয়ে যায় ছাত্রীর অভাবে। পরবর্তী কালে ১৮৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইডেন গার্লস স্কুল। ক্রমান্বয়ে যা পরিণত হয় কলেজে। এখান থেকেই ১৯২১ সালে মুরশিদ ফজিলাতুন্নেসা ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। যদিও এই ধরনের ঘটনা সেই সময়ে ব্যতিক্রম বললে অত্যুক্তি হবে না। সেই সময়ে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমান মেয়েদের পদচারণা একেবারেই উল্লেখ করার মত ছিল না।

১৮৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাইয়ের তিনটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনটিতেই মেয়েদের অংশগ্রহণের অধিকার ছিল না। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ছাত্রীর সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। ৬০-এর দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যার পাশাপাশি

ছাত্রীর সংখ্যাও বাড়তে শুরু করে। ১৯৬০-৬১ সালে ৩১২৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৪৪৪ জন। ১৯৭০ সালে ৭০২৮ শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৮০০ জন ছিল ছাত্রী। ১৯৭২ সাল থেকে নতুন নতুন বিভাগ খোলা শুরু হয়, ছাত্রীর সংখ্যাও বাড়তে থাকে। কিন্তু একই সাথে ঝরে পড়ার প্রবণতাও চলতে থাকে সমান তালে।

১৯৯০ সালে দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হওয়ার পর থেকে ক্রমেই বেড়ে চলেছে নারীশিক্ষার হার। গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক পরিচালিত এডুকেশন ওয়াচের ২০০৮-এর একটি গবেষণা থেকে জানা যায়, "গত এক দশকে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া, প্রাথমিক শিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার হার বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে ১৩.৪%-১৩.৭% এবং ২.৮% কিন্তু এই তিনটি ক্ষেত্রেই গত এক দশকে নারীরা পুরুষদের তুলনায় পেছনে অবস্থান করছে। যদিও উন্নতির ধারাবাহিকতায় নারীরা পুরুষদের চাইতে বেশী এগিয়েছে।" তবে কতটুকু এগুলাম আমরা? যেখানে ছিলাম তার থেকে এগিয়েছি বটে। কিন্তু যতটুকু কথা ছিল ততটুকু পেরেছি কি? যদি পেরেই থাকি তবে ঝরে পড়ার হারে কেন এখনও মেয়েরা এগিয়ে? ঝরে পড়ার কারণগুলোতে পরিবর্তন আসছে না কেন?

১৮৭৫ সালে বাংলায় প্রকাশিত প্রথম আত্মজীবনীর রচয়িতা ছিলেন 'রাসসুন্দরী'। আপন প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আহ্বানেই তিনি এ কাজটি করেছিলেন। এমন একটি সময়ে তার বেড়ে ওঠা, যখন ভাবা হতো মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে সংসারে অমঙ্গল হয়। ৮ বছর বয়সে খেলার সঙ্গিনীর হাতে লাঞ্ছিত হবার ফলে প্রতিদিন তাকে বাড়ির পাঠশালায় রেখে আসা হতো। সেখানে তাকে পড়ালেখা শেখানোর কোন চেষ্টা করা হয়নি। কেননা পড়ালেখা মেয়েদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। তিনি পাঠশালায় চুপচাপ বসে থাকলেও পাঠশালার ছেলেরা কি করছে গভীর মনোযোগ দিয়ে তিনি তা দেখতেন। এক পর্যায়ে তিনি পড়তে শিখে ফেলেন। কিন্তু লিখতে পারতেন না। তিনি যে পড়তে জানেন- তা তিনি অন্য কাউকে সাহস করে কখনো বলেননি। প্রতিকূল পরিবেশে ৮ বছরের সেই ছোট্ট মেয়েটি ৬০ বছর বয়সে লিখে ফেলেন 'আমার জীবন'। সপ্তম পুত্র কিশোরীলালের ইচ্ছাতে লেখা শেখা শুরু করেন ১৮৬৪ সালে পুত্রের কাছে চিঠি লেখা দিয়ে। ১৮৭০ সালে লিখে ফেলেন আত্মজীবনী। বোধের মুক্তির কি স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ! পরিবারের চার দেয়ালের গণ্ডির বাইরে যার খুব বেশী দেখার সৌভাগ্য হয়নি তারই মনের দু'চোখ দিয়ে আজ আমরা দেখতে পাই সেই সময়কে ।

আর এই সময়ে? চাইলেও সবসময় পারছে কি জুঁইরা শিক্ষার অধিকার চর্চা করতে? স্বামী চায়নি জুঁই আর পড়াশোনা করুক। স্বামীর অন্যায় চাওয়াকে প্রাধান্য না দিয়ে নিজের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে নরসিংদী কলেজে ভর্তি হয়েছিল সে। চলছিল নানা গুঞ্জন, মানসিক অত্যাচার। জুঁই অতি আধুনিক হয়ে গেছে। বেপরোয়া, উশৃঙ্খল জীবনযাপন করতে চায়। অনেক ছেলে বন্ধু। স্বামীকে মানতে চায় না। নানাজনের নানা কথা। সব কিছু মুখ বুজে মেনে নিয়ে শুধুমাত্র পড়ালেখা চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্তে অটল থাকে সে। বাবা তাকে ভর্তি করিয়ে দেন নরসিংদী কলেজে। গল্পটা তখনও গল্প হয়ে ওঠেনি। তখনও ছিল বাস্তব। জীবনের সাথে যুদ্ধ। অস্তিত্বের লড়াই। পড়াশোনা করার তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে গুড়িয়ে দেবার জিঘাংসা থেকে সুপরিকল্পিতভাবে পৈশাচিক নির্মমতায় জুঁইয়ের হাতের পাঁচটি আঙ্গুল কেটে ফেলা হয়। আর তখনই বর্তমান জুঁই এক করুণ ও বিদ্রোহী জীবনের গল্প হয়ে ওঠে। দেশ ছাড়িয়ে বিদেশ, সর্বত্র জানাজানি হয়,কানাকানি হয়। কি নির্মম! কি নিষ্ঠুর! কি বীভৎস! গল্পের কারসাজিতে নয়, সত্যি সত্যিই জিতে গিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে জুঁই। কাঁটা আঙ্গুল নিয়েই পরীক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনের অনুমতিতে সিদ্ধান্ত হয়, জুঁইয়ের আত্মীয় দশম শ্রেণীর ছাত্রী সানিয়া সুলতানা তাকে সাহায্য করবে পরীক্ষার খাতায় লিখতে। অবশেষে যে পরীক্ষা বন্ধ করার জন্য জুঁইকে ডান হাতের সবগুলো আঙ্গুল হারাতে হলো, সেই পরীক্ষা জুঁই দেয়। সমস্ত বাধা পেরিয়ে ২০১২ সালের এইচ এস সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং এ গ্রেডে জিপিএ-৪.৩০ পেয়ে পাস করেছে। এই জুঁই জনারণ্যে হারিয়ে যাবে না তো? ভীড়ের মাঝে একটি দুটি কিংবা আরও বেশি মানুষ মিলবে তো তার পাশে শেষ পর্যন্ত?

নারীশিক্ষা নিয়ে রক্ষণশীলদের সকল দ্বিধা, বাধা অতিক্রম করে নারীশিক্ষার হার বেড়েই চলেছে। শিক্ষার কোন ক্ষেত্রেই এখন আর মেয়েদের প্রবেশে বাধা নেই। হতাশার মাঝেই আছে আশা। অন্ধকারেই জ্বলে জোনাক পোকা। হাউসহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে ২০১০-এর ভিত্তিতে বিশ্ব ব্যাংকের বিশ্লেষণে জানা যায়, প্রাথমিকে তো বটেই, মাধ্যমিকেও এখন ছেলের চেয়ে মেয়ের সংখ্যা বেশি। মেয়েদের ক্ষেত্রে নেট ভর্তির হার ৪৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে আর ছেলেদের ক্ষেত্রে এ হার ৩২ শতাংশ থেকে ৪৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রীর সংখ্যা বাড়লেও তা এখনও মোট শিক্ষার্থীর ২৬ শতাংশ। বিভিন্ন গবেষণা থেকে একথা বলা যায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ে মেয়েদের ভর্তির হার বাড়লেও ছেলেদের চাইতে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার বেশি। মাধ্যমিক স্তরেও ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশী ঝরে পড়ে। তাহলে ঘুরে ফিরে কি দাঁড়ালো? আর এর অন্যতম কারণ হলো দারিদ্র্য ও বাল্যবিবাহ। তবে ঘুণপোকার মত এই দরিদ্রতা ও বাল্যবিবাহ নামক সামাজিক সমস্যাগুলো কি থেকেই যাবে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে? এগিয়ে আসতে হবে সকলকে। যত যাই হোক লক্ষ্য হিসেবে "শিক্ষা" থাকবে স্থির। হয়তোবা সময়ের সাথে পরিবর্তন হবে তার প্রায়োগিক নানা দিক।

সাকিলা মতিন মৃদুলা
উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক
গণসাক্ষরতা অভিযান

শিক্ষামূলক যাত্রার দ্বিতীয় পর্ব শুরু

এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, যাত্রায় লোকশিক্ষা হয়। এক অর্থে যাত্রাদল যুগ যুগব্যাপী ভ্রাম্যমাণ বিদ্যালয়ের ভূমিকা পালন করে আসছে। যাত্রাই হচ্ছে একমাত্র মাধ্যম, যা বাংলাদেশের লোকজজীবনকে উজ্জীবিত করে। সঠিক তথ্য পৌঁছে দেয়া গ্রাম-গঞ্জ ও শহর-বন্দরে। গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় এবং দেশ অপেরার তত্ত্বাবধানে সারা দেশে চলছে শিক্ষাসচেতনতামূলক যাত্রার আয়োজন। আজ বৃহস্পতিবার শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় পর্ব। এর প্রথম পর্ব শেষ হয়ে ডিসেম্বর মাসে। আজ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার রহনপুরে চৈতালী অপেরা *মা-মাটি-মানুষ* এবং আগামীকাল শুক্রবার ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইলে একই পালা মঞ্চায়ন করবেন যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদ কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার শিল্পীরা। ১৯ জানুয়ারি নাটোর জেলার সিংড়া থানার বয়লার বাজারে মহানন্দা যাত্রা ইউনিটের *মেঘে ঢাকা তারা* এবং ২৯ জানুয়ারি ফেনী জেলার দাগনভূঞায় দেশ অপেরার পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হবে অনুসন্ধান যাত্রাপালা।

গত ডিসেম্বরে অন্য চারটি দলের পরিবেশনায় দিনাজপুর, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ জেলায় শিক্ষামূলক চারটি যাত্রাপালা মঞ্চায়িত হয়।

শিশুদের স্কুলে ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য ২০১১ সাল থেকে গণসাক্ষরতা অভিযানের কার্যক্রমে ঐতিহ্যবাহী যাত্রাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এবং এর সার্বিক পরিচালনায় রয়েছেন যাত্রাব্যক্তিত্ব ও দেশ অপেরার অধিকারী মিলন কান্তি দে। শিক্ষামূলক যাত্রানুষ্ঠানগুলো উন্মুক্ত থাকায় প্রচুর দর্শক হচ্ছে এবং যাত্রাশিল্পের প্রতি একশ্রেণীর উন্নাসিক মহলের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিও পাল্টাচ্ছে।

প্রথম আলো ১৬.০১.২০১৪

সহজ শিক্ষা উপকরণ ও সহায়তা বাড়ানোর আহ্বান

সবার কাছে সহজ শিক্ষা উপকরণ ও সহায়তা বাড়ানোর পাশাপাশি মুক্ত সফটঅয়্যার, পাঠ্যবই, শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার করা এবং এর সামগ্রিক মানোন্নয়নের আহ্বান জানান ইএফডি ২০১৪ আলোচনা সভায় বক্তারা। গতকাল বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক (বিডিওএসএন) এবং ওপেন নলেজ ফাউন্ডেশন নেটওয়ার্ক (ওকেএফএন) বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশে এডুকেশন ফ্রিডম ডে (ইএফডি) ২০১৪ পালন উপলেক্ষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে মুক্ত আলোচনা, শিক্ষাবিষয়ক সফটঅয়্যার ও উপকরণ সহজে কীভাবে সবার কাছে পৌঁছানো যায় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। বিডিওএসএনের সাধারণ সম্পাদক মুনির হাসান জানান, মুক্ত শিক্ষাবিষয়ক উপকরণ সহজলভ্য করতে ইতোমধ্যে বিডিওএসএন যৌথভাবে মুক্ত শিক্ষাবিষয়ক ওয়েবসাইট (www.shikkhok.com) সঙ্গে যৌথভাবে কাজ শুরু করেছে। এ কার্যক্রম ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ চলছে বলেও জানান তিনি। ওকেএফএন বাংলাদেশ অ্যাম্বাসাডর ও বাংলা উইকিপিডিয়ার প্রশাসক নুরুন্নবী চৌধুরী হাছিব বলেন, মুক্ত শিক্ষা কার্যক্রম সহায়তা করতে শিক্ষাবিষয়ক ওয়েবসাইট ও উপকরণ সহজলভ্য করতে পারলে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে। এতে উপস্থিত ছিলেন মুক্ত আসরের সভাপতি আবু সাঈদ, বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির সহকারী সমন্বয়ক আইয়ুবুর রহমান, মাধ্যমিক উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা মো. আরিফুল ইসলাম, প্রকৌশলী মো. আবু তাহের, ওকেএফএন বাংলাদেশর কেন্দ্রীয় সদস্য রাহিতুল ইসলাম রুয়েল প্রমুখ।

আমাদের সময় ২০.০১.২০১৪

জাতীয়করণের সুবিধা পাচ্ছেন লক্ষাধিক প্রাথমিক শিক্ষক

জাতীয়করণের আওতাভুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লক্ষাধিক শিক্ষক এক বছর পর সরকারি আর্থিক সুবিধা পেতে যাচ্ছেন। তিনটি ধাপে শিক্ষকরা এই সুবিধা পাবেন। গতকাল মঙ্গলবার শিক্ষকদের জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেতন জাতীয় বেতন স্কেলে নির্ধারণ করে আদেশ জারি করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রধান শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তাঁরা জাতীয় বেতন স্কেলের ১৩শ গ্রেডে বেতন-ভাতা পাবেন। প্রশিক্ষণবিহীনরা পাবেন ১৪শ গ্রেডে। সহকারী শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তাঁরা পাবেন ১৫শ গ্রেডে। আর প্রশিক্ষণবিহীনরা পাবেন ১৬শ গ্রেডে।

সরকারি আদেশে আরো বলা হয়, তিন ধাপে শিক্ষকদের পূর্ণ আর্থিক সুবিধা দেওয়া সম্পন্ন হবে। এর মধ্যে ২০১২- ১৩ অর্থ বছরে পূর্ণ বেতন, পূর্ণ চিকিৎসা ভাতা, পূর্ণ টিফিন ভাতা ও বছরে একটি উৎসব ভাতা পাবেন। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে পূর্ববর্তী অর্থ বছরের দেওয়া সুবিধাসহ পূর্ণ শিক্ষা সহায়ক ভাতা, একটি উৎসব ভাতা ও বাড়িভাড়ার ২০ শতাংশ পাবেন। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে পূর্ববর্তী অর্থ বছরের সুবিধাসহ বাড়িভাড়ারর বাকি ২০ শতাংশ পাবেন।

গত বছরের ৯ জানুয়ারি রাজধানীতে আয়োজিত এক শিক্ষক সমাবেশে প্রায় ২৬ হাজার বেসরকারি বিদ্যালয় ও এসব বিদ্যালয়ের এক লাখ তিন হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করার ঘোষণা দেন প্রাধনমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কিন্তু আইনি ও দাপ্তরিক প্রক্রিয়ার কারণে এই দীর্ঘ সময়ে বিদ্যমান সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকের অনুরূপ বেতন-ভাতা পাচ্ছিলেন না।

কালের কণ্ঠ ২২.০১.২০১৪

স্কুলশিক্ষার্থীদের জন্য তথ্য সাক্ষরতা

ঢাকার সাভারে স্কুলশিক্ষার্থীদের নিয়ে শুরু হয়েছে তথ্য সাক্ষরতা ও জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্র ও সেন্টার ফর ইনফরমেশন স্টাডিজ, বাংলাদেশ দুই দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। এতে সহায়তা করছে নেদারল্যাণ্ডস ও বাংলাদেশের রোটারি ক্লাব।

সাভার বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গতকাল বুধবার সকালে এর উদ্বোধন করেন জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা। সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাহেলা খানম।

প্রশিক্ষণে সাভার পৌর এলাকার অধর চন্দ্র উচ্চবিদ্যালয় ও রেডিও কলোনি উচ্চবিদ্যালয় সাভার বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ৩০ জন শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। গতকাল তাদের জাতিসংঘ, সাক্ষরতা ও তথ্য সাক্ষরতাসহ মুদ্রণ, অমুদ্রণ ও প্রযুক্তিগত তথ্যের উৎস এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মু. মেজবা-উল-ইসলাম, মো. মনিরুজ্জামান, মিনহাজ উদ্দীন আহাম্মদ, সৈয়দ শাহরিয়ার মেনজিস প্রমুখ।

প্রথম আলো ২৩.০১.২০১৪

অবহেলিত শিশুদের আলোকিত করছে ফ্রেন্ডশিপ স্কুল

সুবিধাবঞ্চিত অবহেলিত শিশুদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে টাঙ্গাইলে জুয়েল আহমেদ নামের এক কলেজছাত্র গড়ে তুলেছে ফ্রেন্ডশিপ স্কুল। বিভিন্ন স্কুল থেকে ঝরে পড়া অন্তত ৭০ কোমলমতি শিশু সম্পূর্ণ বিনা খরচে লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষা উপকরণও পাচ্ছে বিনামূল্যে।

শিক্ষার পাশাপাশি প্রত্যন্ত এলাকার স্কুলগুলোতে গিয়ে জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার, বাল্যবিয়ে ও

মাদকবিরোধী নাটক, পথনাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করছে ফ্রেন্ডশিপ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা জুয়েল। নিরক্ষরমুক্ত সমাজ গড়তে টাঙ্গাইলের মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান আদর্শ কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র জুয়েল আহমেদ নিজ বাড়ি শহরের আদি টাঙ্গাইলে গড়ে তুলেছেন একটি ফ্রেন্ডশিপ স্কুল। শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত শিশুরা সম্পূর্ণ বিনাখরচে লেখাপড়া করছে সেখানে। শিশুদের বেশিরভাগই দিনমজুর বা বিভিন্ন শ্রমিক শ্রেণীর সন্তান। এদিকে জুয়েলের ফ্রেন্ডশিপ স্কুলে সন্তানদের লেখাপড়ার সুযোগ পাওয়ায় খুশি অভিভাবকরাও। এ অবস্থায় ফ্রেন্ডশিপ স্কুল ছেলেমেয়েদের শিক্ষা লাভের সুযোগ দেয়ার কারণে বাচ্চাদের ভবিষ্যত নিশ্চিত হয়েছে। ফ্রেন্ডশিপ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা জুয়েল আহমেদ বললেন, ফ্রেন্ডশিপ স্কুলের পাশাপাশি হিউম্যানিটি ফর পিপলস নামে একটি সংগঠন করা হয়েছে, শুধু সুবিধাবঞ্চিত-অবহেলিত শিশুদের সু-শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য। আমরা বন্ধুরা টিউশনি ফ্রি এবং টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে এই সংগঠনের তহবিল গঠন করেছি। সরকারীভাবে এ প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা হবে। এছাড়া তাদের সার্বিকভাবে সহযোগিতা করার জন্য তিনি সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

জনকণ্ঠ ৪.০১.২০১৪

৫৩১ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা: নাহিদ

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রতিরোধের নামে ৫৩১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়েছে। এতে সারা দেশে ৪১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৮২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২১টি মাদ্রাসা ও ৯টি কলেজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গতকাল রাজধানীর দক্ষিণখানের ফায়েদাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, সারা দেশে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের পর শীঘ্রই তা খতিয়ে দেখে মেরামত, সংস্কার বা নির্মাণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা যাতে কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকে নজর দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষমন্ত্রী আরও বলেন, নির্বাচন প্রতিরোধের নামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে সভ্যতাবিনাশী অপকর্ম এ দেশের আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাসে একটি জঘন্য নজির। এ ধরণের জঘন্য, বর্বরোচিত অমানবিক হামলা দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করে দেওয়ার অপচেষ্টা। বিএনপির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় স্বাধীনতা-বিরোধী জামায়াত-শিবির একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে আন্দোলনের আড়ালে সন্ত্রাস ও নাশকতা চালাচ্ছে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন ৮.০১.২০১৪

গফরগাঁওয়ে টাকার বিনিময়ে বিনামূল্যের পাঠ্যবই!

প্রতি সেট ৩৫০ টাকা

গফরগাঁও উপজেলার চরআলগী ইউনিয়নে টাকার বিনিময়ে ২টি স্কুলে শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। চরাঞ্চলের দরিদ্র পরিবারের কোন শিক্ষার্থী টাকা দিতে না পারলে তাদেরকে ক্লাস চলাকালীন সময়ে দাঁড় করিয়ে রেখে বকাঝকা/তিরস্কার করা হয় বলে একাধিক অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে। প্রতিকার চেয়ে অভিভাবকরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর অভিযোগ দাখিল করেছেন।

দায়ের করা অভিযোগ, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সূত্রে জানা গেছে, চলতি শিক্ষা বছরে চরআলগী ইউনিয়নের চরমছলন্দ মুসলিম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৫২০ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে বিনামূল্যের বই সরবরাহ করা হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ বই বিতরণের সময় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রতি সেট বইয়ের জন্য ৩৫০ টাকা আদায় করছে। দরিদ্র পরিবারের কোন শিক্ষার্থী দাবিকৃত টাকা দিতে না পারলে কিংবা কিছু টাকা কম দিলে তাদেরকে ক্লাসরুমে অন্য শিক্ষার্থীদের সামনে হাত তুলে দাঁড় করিয়ে বকাঝকা করা হয়। অপমানিত হয়ে অনেক শিক্ষার্থী কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে। চরমছলন্দ গ্রামের রয়েল মিয়া বলে, ৩/৪ দিন পূর্বে আমার মেয়ে রাত্রি স্কুলে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়ে কাঁদতে থাকে। কারণ জানতে চাইলে সে জানায়, ৩৫০ টাকা ছাড়া স্কুলে গেলে স্যার বই না দিয়ে বকাঝকা করে। পরে ধার কর্জ করে ৩৫০ টাকা দিলে সে বিদ্যালয়ে গিয়ে বই বই নিয়ে আসে। চরমছলন্দ মুসলিম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহবুবুর রহমান বলেন, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সেশন ফি বাবদ ৩৫০ টাকা আদায় করা হয়েছে। রশিদ বই ছাপানো না থাকায় রশিদ দেয়া হচ্ছে না। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রেজাউল বারী বলেন, অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত ছাড়া কিছু বলা যাবে না।

একই ইউনিয়নের উত্তর চরমছলন্দ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ৬ শতাধিক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে বিনামূল্যের বই দিয়ে জনপ্রতি ১০ টাকা থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রধান শিক্ষক আমানউল্লাহ স্বপন অভিযোগ অস্বীকার করেন। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবু তালেব মিয়া বলেন, আমানউল্লাহ স্বপন বিভিন্ন অভিযোগে সাময়িক বরখাস্ত আছেন। বর্তমানে স্কুলের কোন কাজে তার সম্পৃক্ততা থাকার কথা নয়।

ইত্তেফাক ১৪.০১.২০১৪

ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মামলা করার নির্দেশ শিক্ষামন্ত্রীর

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বর্বরোচিত হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে স্থানীয় থানায় মামলা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক এবং গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক জরুরি বৈঠকে এ নির্দেশ দেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, মন্ত্রী সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, এলাকাবাসীকে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। বৈঠকে মন্ত্রী বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংসকারী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধ করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। অন্যদিকে, অর্থের লোভে নিজ স্কুলে আগুন দেয়ার অভিযোগে আটক বগুড়ার শাজাহানপুরের সুজাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। সভায় এ ধরণের অপকর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে। প্রসঙ্গত, সারা দেশে প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী ৪১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৮২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২১টি মাদরাসা ও ৯টি কলেজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ চলছে। শিগগিরই তা খতিয়ে দেখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মেরামত, সংস্কার বা নির্মাণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আলোকিত বাংলাদেশ ৯.০১.২০১৪

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে জনঅংশগ্রহণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা

গণসাক্ষরতা অভিযান পরিচালিত 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত এলাকায় স্থানীয়ভাবে গঠিত অনানুষ্ঠানিক সংগঠন 'কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ' (সিইডব্লিওজি) মানসম্মত শিক্ষা অর্জন, ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, বাল্যবিবাহ রোধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটিসমূহকে সহায়তা প্রদান করে আসছে।

উপর্যুক্ত কমিটি ও সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিগণের অংশগ্রহণে "প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে জনঅংশগ্রহণ" শীর্ষক ২টি মতবিনিময় সভা গত ২৫ ও ৩০ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে মেহেরপুর জেলার সদর ও মুজিবনগর উপজেলার আমদহ ও দারিয়াপুর ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় অতিথি ও রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আপিল উদ্দীন, সহকারি প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. নাসির উদ্দীন, সদর উপজেলা ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর মো. মফিজুর রহমান ও সহকারি প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মাসুদুর রহমান। সভা দু'টিতে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে আমদহ কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর সভাপতি ডা. হাশেম আলী ও দারিয়াপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর সভাপতি মো. ওয়াজেদ আলী। গণসাক্ষরতা অভিযান-এর পক্ষ থেকে সভায় উপস্থিত ছিলেন উপ-কার্যক্রম

ব্যবস্থাপক মোশাররফ হোসেন ও উর্ধ্বতন কার্যক্রম কর্মকর্তা আবু রেজা। সভায় মোট ৬৯ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

মোশাররফ হোসেন

জনযোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষা বিষয়ে ক্যাম্পেইন

শিশুদের স্কুলে ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ ও শিক্ষা সমাপনের উপর দেশের ৭টি বিভাগের ১০টি জেলায়

গত ৫-৩০ জানুয়ারি গণসাক্ষরতা অভিযান ও এর সহযোগী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে একটি ক্যাম্পেইন আয়োজন করা হয়েছে। এই ক্যাম্পেইনে প্রতিটি জেলায় একটি করে রিক্সা র‍্যালী ও অভিভাবকদের নিয়ে ১০টি জেলায় ৩০টি উঠান বৈঠক আয়োজন করা হয়। প্রতিটি উঠান বৈঠকে ২৫-৩৫ জন অংশগ্রহণ করেন। ১০টি জেলায় ১০টি বর্ণাঢ্য রিক্সা র‍্যালী আয়োজনের পাশাপাশি দেশের ৪টি স্থানে (চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, ময়মনসিংহ ও লক্ষীপুর) বাংলাদেশ যাত্রা শিল্প উন্নয়ন পরিষদের সহযোগিতায় ৪টি যাত্রাপালা মঞ্চায়ন করা হয়। উল্লিখিত কর্মসূচিগুলোতে সরকারি কর্মকর্তা, বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন, শিক্ষক সমিতি, গণমাধ্যম প্রতিনিধি, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সাংস্কৃতিক কর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়। প্রতিটি র‍্যালীতে প্রায় ২০০ জন এবং প্রতিটি যাত্রাপালায় প্রায় ১৫০০ জন অংশগ্রহণ করে।

আবেদা সুলতানা

'শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জসমূহ ও আমাদের করণীয়' শীর্ষক কর্মশালা

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষকেন্দ্রিক 'শিখন ও শেখানো প্রক্রিয়া' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ও তাদের মাঝে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে ফলপ্রসু শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় মূল ভূমিকা পালন করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ।

উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে গত ২৬-২৯ জানুয়ারি মেহেরপুর মডক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে 'কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ' এলাকার বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক প্রতিনিধি, শিক্ষক-অভিভাবক এসোসিয়েশন প্রতিনিধি, স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ প্রতিনিধিগণের অংশগ্রহণে "শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জসমূহ: আমাদের করণীয়" শীর্ষক ২টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত উপর্যুক্ত কর্মশালায় মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ও মোনাখালী ইউনিয়ন-এর ৬৪ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

প্রদর্শন, দলীয় আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময়, অনুশীলন পদ্ধতির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ শ্রেণীকক্ষকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করেন এবং তা মোকাবেলায় স্থানীয়ভাবে করণীয় নির্ধারণ করেন। চিহ্নিত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় স্থানীয়ভাবে করণীয় প্রসঙ্গে অংশগ্রহণকারীগণ এসএমসি-র উদ্যোগে এবং বিত্তবানদের সহযোগিতায় বাড়তি শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ,

আসবাবপত্র মেরামত, প্যারা শিক্ষক নিয়োগের উপর জোর দেন।

মোশাররফ হোসেন

'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে কারিগরি শিক্ষার সংযোগ সাধন' শীর্ষক ওরিয়েন্টেশন

তৃণমূল পর্যায়ে সাক্ষরতা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সংযোগ সাধন করে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি এবং এ বিষয়ক ধারণা বিস্তরণ করার লক্ষ্যে গত ২০-২৩ জানুয়ারি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-এর আর্থিক সহায়তায় রাসিন-ফরিদপুর ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর যৌথ উদ্যোগে নারী উন্নয়ন ফোরাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত হয় 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে কারিগরি শিক্ষার সংযোগ সাধন' শীর্ষক ৪ দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন। ওরিয়েন্টেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে

উপস্থিত ছিলেন ফরিদপুর-এর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জাহাঙ্গীর হোসেন। উপর্যুক্ত কোর্সে অংশগ্রহণকারী হিসেবে শিক্ষা ও সাক্ষরতা কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট ফরিদপুর জেলা ও পার্শ্ববর্তী জেলায় কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের উর্ধতন পর্যায়ের প্রতিনিধি, সরকারি প্রতিনিধি ও শিক্ষক প্রতিনিধিসহ ৩০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ওরিয়েন্টেশন কোর্সে সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষার ধারণা, দক্ষতা ও আত্ম উন্নয়নের সম্পর্ক, বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত ও প্রয়োজনীয়তা, সাক্ষরতা কার্যক্রমের সঙ্গে কারিগরি ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার সংযোগ সাধন প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা ও স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারিভাবে পরিচালিত কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন-এর সুযোগ রাখা হয়।

ওরিয়েন্টেশন কোর্সে সহায়ক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক মো. মিজানুর রহমান আখন্দ, আইডিইবি, ঢাকার পরিচালক

মো. শাহ আলম মজুমদার, ফরিদপুর-এর বিএনএফই সহকারি পরিচালক নিলুফার চৌধুরী।

মো. মিজানুর রহমান আখন্দ

১১-১৯ বেড়ে ওঠা' কিশোর-কিশোরী বয়ঃসন্ধিকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার ও চ্যালেঞ্জ

বিভিন্ন তথ্যদাতাদের অংশগ্রহণে আয়োজন করা হয় ১১-১৯ বেড়ে ওঠা' কিশোর-কিশোরী বয়ঃসন্ধিকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় স্থানীয় নেতৃবৃন্দের ভূমিকা শীর্ষক মতবিনিময় সভা। গণসাক্ষরতা অভিযান ও ব্র্যাকের যৌথ উদ্যোগে গত ৩০ জানুয়ারি রংপুর জেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্থানীয় পর্যায়ের নীতিনির্ধারণীর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

সভায় এই মত প্রকাশ করা হয় যে, কিশোর-কিশোরীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রাম-গঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চলের Film Show-এর মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ক্যাম্পেইন-এর মাধ্যমে বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলো নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হলে কিশোর- কিশোরীরা সামনের দিনগুলোতে ভালভাবে এগিয়ে যেতে পারবে।

খালেদা হাবিব

৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণীর নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনার প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুসারে এনসিটিবি কর্তৃক পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুসারে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের তথ্যগত ত্রুটি, বানান ও মুদ্রণজনিত ত্রুটি সংশোধনে সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে গণসাক্ষরতা অভিযান সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পর্যালোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতামত সংকলিত করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করতে

গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রশিক্ষণ কক্ষে পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ বিষয়ক এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর অনুষদের প্রাক্তন পরিচালক প্রফেসর ছিদ্দিকুর রহমান। সভায় ২৪ জন পর্যালোচক উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিষয়ভিত্তিক সংকলিত চূড়ান্ত মতামত দ্রুততম সময়ে এনসিটিবি বরাবর প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

মির্জা মো. দেলোয়ার হোসেন

শীতার্তদের কম্বল বিতরণ

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরীর নের্তৃত্বে অভিযানের কর্মীগণ দেশের

সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র শীতার্ত মানুষের শীত লাঘবের জন্য শীতবস্ত্র বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই উদ্যোগের আওতায় গণসাক্ষরতা অভিযান তার ৫টি সহযোগী সংগঠন যথাক্রমে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক), সোসিও ইকোনোমিক এন্ড রুরাল এডভান্সমেন্ট (সেরা), মাহালী আদিবাসী আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা (মাসাউস), লাহান্তি ফাউন্ডেশন ও বরেন্দ্র ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (বিডিও)-এর মাধ্যমে মেহেরপুর জেলায় আমঝুপি, নেত্রকোনার দুর্গাপুর, রাজশাহীর গোদাগাড়ী এবং নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুরে দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ১২০০টি কম্বল বিতরণ করে।

সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, গণসাক্ষরতা অভিযান বিগত কয়েক বছর যাবৎ সামাজিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত এ সকল জনগোষ্ঠীর আপদকালীন সহায়তা প্রদান করে আসছে।

তাজমুন নাহার

ইভ টিজিং প্রতিরোধে করণীয়

সাম্প্রতিক কালে ইভ টিজিং আমাদের সমাজে এক ভয়ঙ্কর সংক্রামক ও মহামারী ব্যাধি হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে কিশোরী-শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া এর ফলে বিশেষভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অনেক পরিবারের মাতা-পিতা ও অভিভাবক মেয়েকে স্কুলে বা গৃহ শিক্ষককের কাছে পড়তে পাঠিয়ে বিশেষ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় সময় কাটান। অনেক পরিবারের সদস্য নানা সময়ে বখাটেদের হুমকির শিকার হয়েছেন। অতি সম্প্রতি কালে মেয়ের উত্ত্যক্তকারীকে নিবৃত্ত করার চেষ্টার পর একজন মা নিহত হয়েছেন। একজন নীতিবান কলেজ শিক্ষককে ইভ টিজাররা পিটিয়ে হত্যা করেছে। হত্যা করেছে এক কিশোরীর নানাকে।

এই অবস্থার প্রতিকারে সমগ্র সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে।

- ✦ সমাজের সকল মানুষকে সম্মিলিতভাবে ইভ টিজিং প্রতিরোধে সোচ্চার হতে হবে।
- ✦ পাড়া-মহল্লায় এজন্য বিশেষ অভিযান ও সমাবেশ করতে হবে।
- ✦ যুবকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সভা, আলোচনা-সভার ব্যবস্থা করতে হবে।
- ✦ বখাটেদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।
- ✦ কিশোরী ও তরুণীদের সাহস যোগাতে হবে এবং তারা যেন যে কোন ঘটনা চাপা না দিয়ে অভিভাবক ও শিক্ষকদের জানায়, সেজন্য যথাযথ নির্দেশনা দিতে হবে।
- ✦ ইভ টিজিং-এর শিকার মেয়েদের সামাজিক, নৈতিক ও আইনগত সহায়তা দেয়ার জন্য এনজিওদের বিশেষ কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।।
- ✦ অপরাধীকে কোন অবস্থায়ই রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়া যাবে না এবং তাদের সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে।
- ✦ ইভ টিজিং প্রতিরোধে প্রচলিত আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ করতে হবে।
- ✦ স্থানীয় সরকার যথা, ইউনিয়ন, উপজেলা ইত্যাদি পর্যায়ে ইভ টিজিং বিষয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে হবে।
- ✦ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং গণমাধ্যমে এ বিষয়ে নিয়মিতভাবে সংবাদ সরবরাহ করতে হবে।
- ✦ পুলিশ ও ভ্রাম্যমাণ আদালতকে কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করতে হবে।

গণসাক্ষরতা অভিযান তথ্য বিতরণ, সঞ্চালন ও কার্যক্রমের আওতায় জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের বার্তা, তথ্য, শ্লোগান ইত্যাদি *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এ নিয়মিত ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসমূহের উন্নয়নমূলক ও মানবাধিকার সম্পর্কিত এ ধরনের বার্তা, তথ্য ও শ্লোগান বুলেটিন কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য সকল শুভানুধ্যায়ীর কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

সাক্ষরতা বুলেটিন

সংখ্যা ২৩৬ মাঘ ১৪২০ জানুয়ারি ২০১৪

স ম্পা দ ক

আর একটি বছর পেরিয়ে এলাম খ্রিস্টীয় বর্ষপঞ্জির হিসেবে। এমন বর্ষপরিক্রমণের শেষে পুরোনো বছরকে বিদায় দেবার চেয়ে নববর্ষকে স্বাগত জানানোর একটা অধিকতর দৃশ্যমান রীতি গড়ে উঠেছে এই পৃথিবীতে, সেই কবে থেকেই। একটা হিসেব-নিকেশ করা হয়, তার মধ্যে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, সফলতা-হতাশার নানা বিষয়কে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়। বিশেষত, গণমাধ্যমে ঘটনাপঞ্জির বিবিধ পরিসংখ্যান ও বিবরণী পাওয়া যায়। তাতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নানান তথ্য বা চিত্রাবলী সংগ্রথিত হয়। কোন ভয়াবহ বিমান বা ট্রেন দুর্ঘটনা অথবা কোন মনীষী, শিল্পী বা ক্রীড়াবিদের চলে যাওয়ার কথা পুনরায় মনে পড়ে যায়। হয়ত সামান্য ক্ষণের জন্য বিহ্বল বোধ করি।

বিদায়ী বর্ষে কেমন ছিল বাংলাদেশ, কেমন ছিলাম আমরা সাধারণ মানুষ, তেমন এক প্রশ্নের মুখোমুখি আমরা যেন হতবাক হয়ে যাই অথবা চিৎকার করে সমস্বরে বলতে চাই, এমন একটা বছর যেন আর কোনদিন আমাদের জীবনে ফিরে না আসে, আমার সন্তান-সন্ততি ও অনাগত প্রজন্মকে যেন এমন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে না হয়। আর যাই হোক, সুস্থ দেহমনের কোন মানুষ বলতে পারবেন না যে, বিগত বছরে আমরা একটি মানবিক সময়কাল পার হয়ে এসেছি। দু'হাজার তের সালের শুরুতে আমরা কেউ-ই সম্ভবত এমন আশঙ্কা করিনি যে, আগামী দিনগুলিতে আমাদের জন্য এমন অসহ্য অস্থিরতা, অগ্রহণযোগ্য, বিরতিহীন ও ক্রমবর্ধমান হিংসাপ্রবণ অস্বাভাবিকতা, নির্বিচার সন্ত্রাস এবং ক্ষমতার মোহগ্রস্ত দুই শিবিরের যুদ্ধমান পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের অসহায়ত্ব এমন প্রবল মাত্রা অর্জন করবে। সদ্য বিদায় নেয়া বছরের এমন সব রক্তমাখা স্মৃতি আমাদের এখনও তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

অনিশ্চয়তার কালো মেঘ যে একেবারে সরে গেছে তা মনে করার কোন কারণ নেই। নতুন বছরের প্রথম মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষেও দানবিক শক্তির কাছে মানবিক প্রবৃত্তির পরাজয়ই মুখ্য ছিল। এই পৌষেও আমরা কালবৈশাখীর তাণ্ডবের সংকেত শুনেছি। বিপর্যস্ত যাতায়াত ব্যবস্থা, আশঙ্কাকুল গণপরিবহন, অনিরাপদ কর্মক্ষেত্র, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের প্রকট অভাব, অগ্নিদগ্ধ স্কুল এবং অনিশ্চিত শিক্ষা পরিবেশ, হাসপাতালে পোড়া মানুষের গন্ধে সন্ত্রস্ত পরিবার-পরিজন, বোমা-ককটেলের শব্দের অসভ্য করতালি, রাজনৈতিক নেতাদের দাম্ভিক কণ্ঠস্বর, বিলাপ এবং বিয়োগের স্বরধ্বনির বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ২০১৩ এবং নতুন বছরের সূচনা যেন অনিঃশেষ না হয়, এ বছরের জন্য শুধু এইটুকু কামনা আমাদের।

বিচারপতি মুহম্মদ হাবিবুর রহমান আর নেই। তাঁকে হারানোর বেদনা অপরিসীম এবং তাঁর চলে যাওয়ায় যে শূন্যতা সৃষ্টি হল তা পূরণ হবার নয়। বিচারপতি রহমান *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এর নিয়মিত পাঠক ছিলেন এবং এতে তাঁর একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিতও হয়েছিল। গণসাক্ষরতা অভিযান পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক শফি আহমেদ

সম্পাদক
রাশেদা কে. চৌধূরী

গণসাক্ষরতা অভিযান ৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক প্রকাশিত। মেসার্স তিথি প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং, ২৮/সি-১ টয়েনবী সার্কুলার রোড, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা

সম্পাদকীয় যোগাযোগ● ফোন: ৮১১৫৭৬৯, ৯১৩০৪২৭, ৮১৫৫০৩১-২ ফ্যাক্স: ৯১২৩৮৪২মেইল: info@campebd.org Website: www.campebd.org